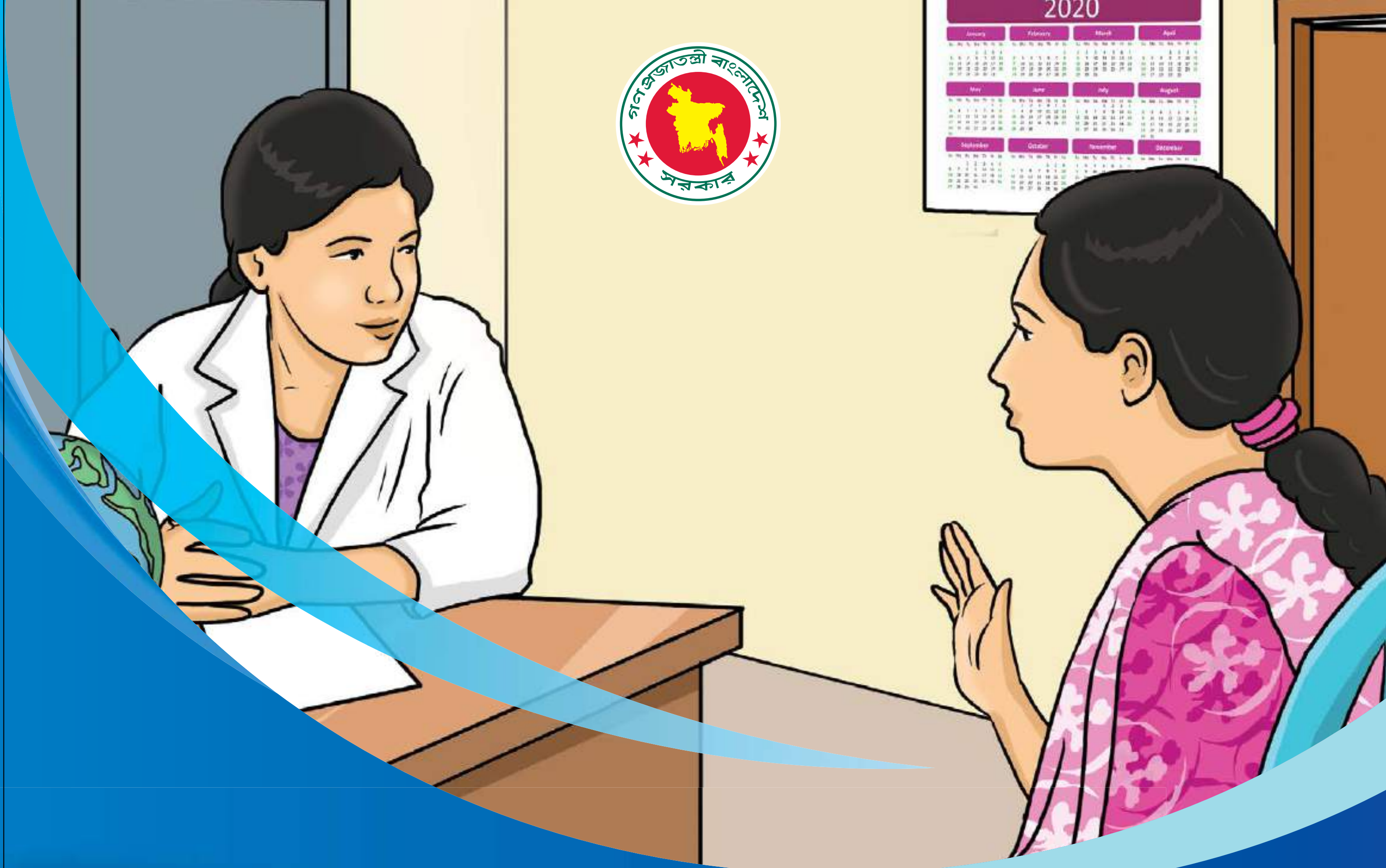

মনোসামাজিক সহায়তা বিষয়ক

সহায়িকা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মনোসামাজিক সহায়তা বিষয়ক

সহায়িকা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

মনোসামাজিক সহায়তা বিষয়ক সহায়িকা

উপদেষ্টা ও নির্দেশক	:	ডা. মো. শামসুল হক লাইন ডিরেক্টর, এমএসসিঅ্যান্ডএএইচ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
সম্পাদক	:	ডা. মো. সবিজুর রহমান প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এডোলসেন্ট অ্যান্ড স্কুল হেলথ প্রোগ্রাম
সহ-সম্পাদক	:	ডা. মো. আমান উল্লাহ, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এডোলসেন্ট হেলথ, এডোলসেন্ট অ্যান্ড স্কুল হেলথ প্রোগ্রাম ডা. সিরাজুম মুনিরা, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, স্কুল হেলথ, এডোলসেন্ট অ্যান্ড স্কুল হেলথ প্রোগ্রাম ডা. মো. জয়নাল হক, প্রোগ্রাম ম্যানেজার (এঅ্যান্ডআরএইচ), এমসিএইচ সার্ভিসেস ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ডা. আবু সাদাত মো. সায়েম, হেলথ স্পেশালিস্ট, ইউনিসেফ
সংকলন	:	ড. নিশাত ফাতিমা রহমান, সহকারী অধ্যাপক, ব্র্যাক শিক্ষা উন্নয়ন ইন্সটিটিউট, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় সাকিলা ইয়াসমিন, সিনিয়র লেকচারার, ব্র্যাক শিক্ষা উন্নয়ন ইন্সটিটিউট, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় রনতী চক্রবর্ত্তী, সিনিয়র কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট, ব্র্যাক শিক্ষা উন্নয়ন ইন্সটিটিউট, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় মরিয়াম সুলতানা, সিনিয়র সাইকোসোশ্যাল কাউন্সেলর, ব্র্যাক শিক্ষা উন্নয়ন ইন্সটিটিউট, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় খাদিজা খাতুন, কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট, ব্র্যাক শিক্ষা উন্নয়ন ইন্সটিটিউট, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ডা. মোঃ হেলালউদ্দিন, সহযোগী অধ্যাপক, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট, ঢাকা
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা	:	ফারহানা শামছ্‌ সুমি, হেলথ অফিসার, ইউনিসেফ ডা. নাসরিন আক্তার, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, মনিটরিং এবং ইভ্যালুয়েশন, এডোলসেন্ট অ্যান্ড স্কুল হেলথ প্রোগ্রাম
প্রকাশক	:	এডোলসেন্ট অ্যান্ড স্কুল হেলথ প্রোগ্রাম, এমএনসিঅ্যান্ডএএইচ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সহযোগিতায়	:	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ব্র্যাক, ইউনিসেফ ও নেদারল্যান্ড দূতাবাস
প্রচ্ছদ	:	এক্সপ্রেশানস্‌ লিমিটেড

মুখবন্ধ

কৈশোরকাল জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সময়ে কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক, মানসিক ও আচরণগত পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনের ফলে তারা বিভিন্ন জটিলতার সম্মুখীন হতে পারে। শুধু পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাদের এই জটিলতা ও বিপর্যয়গুলো মোকাবেলা করার জন্য যথেষ্ট নয়। তাই কৈশোরকালীন সময়ে শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি মানসিক সুস্থতা ও পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মনোসামাজিক বিষয় সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

কিশোর-কিশোরীদের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা উন্নয়ন ইন্সটিটিউট-এর সাইকোসোশ্যাল ওয়েলবিয়িং সেন্টার ২০১৬ সালে "টিচার প্লাস মডেল" নামে একটি গবেষণা প্রকল্প পরিচালনার উদ্যোগ নেয়। এ লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ১৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হয় এবং এ উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষকদের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের মনোসামাজিক শিক্ষা প্রদান করা এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন করা। গবেষণা প্রকল্পের সাথে জড়িত গবেষক, লেখক ও মনোসামাজিক কাউন্সেলরদের নিবেদিত শ্রমই মনোসামাজিক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণকে সফল করেছে। এই প্রশিক্ষণটি পরিচালনার জন্য একটি শিক্ষক সহায়িকা তৈরি করা হয়েছে। পরবর্তীতে এ সহায়িকাটি রিভিউ সাপেক্ষে ২০১৭ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ১৬১ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বর্তমানে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ও ইউনিসেফ-এর উদ্যোগে ও নেদারল্যান্ড দূতাবাসের আর্থিক সহায়তায় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা উন্নয়ন ইন্সটিটিউট এর এ সহায়িকাটি রিভিউ করা হয়। সকলের মূল্যবান মতামত সহায়িকাটিকে আরও সমৃদ্ধ করবে। সর্বোপরি, কিশোর-কিশোরীরা এ সহায়িকাটির মাধ্যমে উপকৃত হলেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

Erum Mariam

ড. ইরাম মরিয়ম
নির্বাহী পরিচালক
ব্র্যাক শিক্ষা উন্নয়ন ইন্সটিটিউট
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

বাণী

কৈশোরকাল এমন একটি সময় যখন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের কারণে কিশোর-কিশোরীরা নানা রকম আবেগ দ্বারা ত্বারিত হয়ে থাকে। তারা নিজেদের সামাজিক অবস্থান নিয়ে সর্বদা শংকিত থাকে। ফলে নিরাপত্তাহীনতা, মানসিক উদ্বেগ, বিষন্নতার মতো সংকট তৈরি হয়। মনের কথাগুলো কারো সাথে খোলাখুলি আলোচনা করতে না পারার কারণে মানসিক চাপ রেড়ে যায়।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশের বেশি হলো কিশোর-কিশোরী। এ বিশাল সম্ভাবনাময় জনগোষ্ঠীর সঠিক এবং পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তাই এ সময় তাদের মনোসামাজিক সহায়তার মাধ্যমে আত্মসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আচরণগত এবং মনোভাবের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনা সম্ভব। মনোসামাজিক শিক্ষা ব্যক্তিকে তার প্রাত্যহিক জীবনে স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সহায়তা করে এবং পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত করে।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা উন্নয়ন ইন্সটিটিউট-এর সাইকোসোশ্যাল ওয়েল বিয়িং সেন্টার কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, UNICEF, UNFPA, WHO, Embassy of the Kingdom of the Netherlands সহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার তাৎপর্যপূর্ণ অবদানে 'মনোসামাজিক সহায়তা বিষয়ক সহায়িকা' প্রকাশিত হলো। তাদের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র ২০১৭-২০৩০-তে গৃহীত কৌশলগুলো প্রণয়ন তথা কিশোর-কিশোরীদের সুস্থ বিকাশে এই সহায়িকাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি। আর এর ফলে বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবে অনেক ধাপ।

ডা. মোহাম্মদ শরীফ
পরিচালক (এমসিএইচ) এবং
লাইন ডাইরেক্টর (এমসিআরএএইচ)
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

বাণী

যেকোনো জাতির জন্য কিশোর-কিশোরী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জনগোষ্ঠী। বয়ঃসন্ধির কালে সঠিক শিখণ ও অনুশীলনের অভাবে মনোবৈকল্য দেখা দিতে পারে যা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। তাই কিশোর-কিশোরীদের দক্ষ ও সাবলীল ব্যক্তিত্বে সহায়ক বলে আমি মনে করি। ইউনিসেফ সহ জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট অঙ্গ সংস্থা এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে এ ব্যাপারে কৌশলগত সহায়তা প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এরই ধারাবাহিকতায় ইতিমধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (SDG) অর্জনের উদ্দেশ্যে কৈশোরীকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র (২০১৭-২০৩০) তৈরি করা হয়েছে। SDG-এর তিন নং লক্ষ্যমাত্রা সকল বয়সের সব মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে তা পূরণে এই সহায়িকাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। বয়সন্ধির টলায়মান মানসিক অবস্থায় শারীরিক পরিবর্তনের কালে যথাযথ সচেতনতা ও শিখণ এর অভাবে একজন ব্যক্তির আকস্মিক বিপর্যয় ও বিপত্তি ঘটা অস্বাভঅবিক নয়। এজন্য মসঠিক জ্ঞান ও অনুশীলনের বিকল্প নেই। একজন সুদক্ষ ও প্রশিক্ষিত সেবা প্রদানকারীই পারেন এই কিশোর-কিশোরীদের এই সময়ে এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সহায়তা করতে। মনোসামাজিক সহায়তা বিষয়ক সহায়িকাটি কিশোর-কিশোরীদের যথাযথ সচেতনতা তৈরিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। এই কিশোর-কিশোরীরা আমাদের সুন্দর ও সমৃদ্ধ আগামীর চাবিকাঠি। তাই তাদের সঠিক জ্ঞান প্রদান, তাদের দক্ষতা উন্নয়নে ও স্বাভাবিক বিকাশের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে তা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। আশাকরি মনোসামাজিক সহায়তা বিষয়ক সহায়িকাটি কিশোর-কিশোরীদের প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াকে সহজতর করবে এবং তারা উপকৃত হবে। এই সহায়িকাটি তৈরিতে যারা সহায়তা করেছেন তাদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ডা. মো. জিয়াউল মতিন
হেলথ ম্যানেজার (এমএনসিএএইচ)
হেলথ সেকশন
ইউনিসেফ বাংলাদেশ

কৃতজ্ঞতা

কিশোর বয়স হলো মানুষের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ সময় তাদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং বুদ্ধিগত বিকাশের পাশাপাশি নানা রকম যৌক্তিক এবং সৃজনশীল চিন্তাভাবনা শুরু হয়। তাই এ সময় মনোসামাজিক সহায়তার মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি এবং তাদের আচরণ ও মনোভাবের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনা এবং সহায়তায় মনোসামাজিক সহায়তা বিষয়ক সহায়িকাটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং বিভিন্ন ওয়ার্কিং কমিটি'র তাৎপর্যপূর্ণ অবদানে সহায়িকাটি প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছে। আমি তাদেরকে জানাই অভিনন্দন। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অবদানের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। এছাড়া ব্র্যাক শিক্ষা উন্নয়ন ইন্সটিটিউট, ইউএনএফপিএ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা যারা সহায়িকাটি প্রণয়নে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। সর্বোপরি ইউনিসেফ বাংলাদেশ-এর কারিগরি সহায়তা এবং নেদারল্যান্ড দূতাবাসের আর্থিক সহায়তায় এই সহায়িকাটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। তাদেরকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

অবশেষে, 'মনোসামাজিক সহায়তা বিষয়ক সহায়িকা' কিশোর-কিশোরীদের আত্মসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আচরণ ও মনোভাবের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে - এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

ডা. মো. শামসুল হক
লাইন ডাইরেক্টর, এমএনসিএন্ডএএইচ
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২

ভূমিকা

আমাদের দেশে বর্তমানে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত কারণে কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার শারীরিক ও মানসিক জটিলতা দেখা দেয়। অতীতে আমরা শুধু শারীরিক স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচর্যা করাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। শারীরিক সুস্থতা তখনই সম্ভব যখন কিনা ব্যক্তির দেহ ও মনের পরিপূর্ণ সমন্বয় ঘটে। শারীরিকভাবে অসুস্থ হলে যেমন পরিচর্যা প্রয়োজন তেমনি মানসিক স্বাস্থ্যের সুরক্ষার জন্য মনোসামাজিক সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, মনোসামাজিক সহায়তা গ্রহণের ফলে কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তাদের উদ্বেগজনক পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারেন।

মনোসামাজিক সহায়তা হলো এমন এক ধরনের সহায়তা যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তির আকস্মিক বিপর্যয়, বিপত্তি, উৎপীড়ন, নিপীড়নের ফলে যে মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে ও স্বাভাবিক জীবনে মানিয়ে নিতে সহায়তা করে। মনোসামাজিক সহায়তা ব্যক্তিকে তার প্রাত্যহিক জীবনে স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সহায়তা করে এবং পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত করে।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, বাংলাদেশে শহরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৩.৪% শিশুরা আচরণগত ও আবেগীয় সমস্যাজনিত রোগে আক্রান্ত (Rabbani & Hossain, 1999) এবং গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২২.৯% কিশোর-কিশোরীরা মানসিক রোগে আক্রান্ত (Jahan et.al, 2004)। NIMH, 2011 রিপোর্ট অনুযায়ী ১৪.৫ মিলিয়ন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ মানসিক রোগে ভূগছে, প্রায় ২০% শিশু যাদের বয়স ১২-১৭ বছর তাদের মানসিক অসুস্থতা রয়েছে। বাংলাদেশে ১০ হাজারেরও বেশি মানুষ আত্মহত্যা করে মারা যায় (WHO, 2014)। বাংলাদেশে প্রতি ৩ জনে একজন অথবা ৫০ মিলিয়ন মানুষ মানসিক রোগে ভূগছে (NIMH&R, 2016)। বাংলাদেশে ৬ মিলিয়নের বেশি লোক বিষন্নতা জনিত রোগ এবং প্রায় ৭ মিলিয়ন লোক উদ্বেগজনিত রোগে ভূগছে (WHO,2017)।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা উন্নয়ন ইন্সটিটিউট-এর সাইকোসোশ্যাল ওয়েলবিয়িং সেন্টার কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১২ সাল থেকে মনোসামাজিক বিষয়ে ট্রেনিং, গবেষণা ও সহায়তা প্রদান করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা উন্নয়ন ইন্সটিটিউট ব্র্যাক-এর বিভিন্ন অঙ্গসংস্থা যেমন- স্কিলস্ ট্রেনিং ফর অ্যাডভান্সিং রিসোর্সেস-এর ১৭০ জন, কিশোরী উন্নয়ন প্রকল্পের ৩২ জন এবং আরবান স্ট্রিট চিলড্রেন প্রোগ্রমের ২২ জন কর্মীকে মনোসামাজিক সহায়তাকারী হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

তরুণ সমাজের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা উন্নয়ন ইন্সটিটিউট-এর সাইকোসোশ্যাল ওয়েলবিয়িং সেন্টার ২০১৫ ও ২০১৬ সালে "মনোসামাজিক সহায়তা মডেল" নামে একটি গবেষণা প্রকল্প পরিচালনার উদ্যোগ নেয়। এই প্রকল্পের অধীনে যথাক্রমে Unite for Body Rights (UBR), Bangladesh Association for Prevention of Septic Abortion (BAPSA) এবং Under Privileged Children's Educational Program (UCEP) এর মোট প্রায় ৬৭ জন প্যারা-কাউন্সেলরকে মনোসামাজিক সহায়তা বিষয়ক সার্টিফিকেট কোর্স প্রদান করা হয়। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল মনোসামাজিক সহায়তাকারীর মাধ্যমে কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের মনোসামাজিক সহায়তা প্রদান করা এবং মানসিক সহায়তার মাধ্যমে যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য সেবার মান নিশ্চিত করা।

পাশাপাশি ২০১৬ সালে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা উন্নয়ন ইন্সটিটিউট "টিচারস প্লাস মডেল" নামে একটি গবেষণা প্রকল্প পরিচালনার উদ্যোগ নেয়। যেখানে শিক্ষকদেরকে ৫ দিনব্যাপী মনোসামাজিক ও যৌন-প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে অধিবেশন পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২০১৭ সালে ১৫৫ জন সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীগণ ৫ দিনব্যাপী আবাসিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল স্বাস্থ্যসেবার মধ্যে কিশোর-কিশোরীদের সাথে ফলপ্রসূ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা এবং সমমর্মিতার সাথে মনোসামাজিক ও যৌন-প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা। সর্বোপরি এই প্রশিক্ষণের ফলে কিশোর-কিশোরীদের যৌন প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার মান আরও উন্নত করা।

১৯১৬ সালে ইউএন অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলো বাংলাদেশকে সঙ্গে নিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে Sustainable Development Goals (SDGs) অর্জনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে, যা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলের অন্তর্ভুক্ত। SDGs এর তিন নম্বর Goal এ সকল বয়সের সব মানুষের সুস্বাস্থ্য ও ওয়েলবিয়িং নিশ্চিত করার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

Sustainable Development Goals (SDGs) অর্জনের উদ্দেশ্যে National Adolescent Health Strategy and Policy তৈরি করা হয়েছে যেখানে UNFPA, UNICEF এবং WHO বাংলাদেশ সরকারের সাথে কৌশলগত সহায়তা যেমন- প্রমাণভিত্তিক ইন্টারভেনশন, সেবা প্রদানের গুণগত মান নিশ্চিত করা এবং কিশোর-কিশোরীদের ওয়েলবিয়িং ও বিকাশ নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্যসেবা প্রক্রিয়া শক্তিশালী করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

আজকের কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীরা ভবিষ্যতে জাতিকে নেতৃত্ব দেবে। কাজেই তাদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা অপরিহার্য এবং মনোসামাজিক সহায়তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের সক্ষম ব্যক্তিত্বে পরিণত করতে সাহায্য করবে।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠানং
স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য, মনোসামাজিক সহায়তা, মনোসামাজিক শিক্ষা, মনোসামাজিক সহায়তাকারীর গুণাবলি, বয়সন্ধিকাল, কৈশোরকালীন শারীরিক পরিবর্তন, মাসিক বলতে কী বোঝায়, মাসিক, মাসিক ব্যবস্থাপনা, কৈশোরকালীন মনোসামাজিক পরিবর্তন ও জটিলতাসমূহ, শান্তি ও সংঘর্ষ, আবেগ ব্যবস্থাপনা, উদ্বেগ, সামাজিক উদ্বেগ, মানসিক চাপ ও রাগ ব্যবস্থাপনা, মাদকাসক্তি ও এর প্রতিকার, পরীক্ষা-ভীতি ও ব্যবস্থাপনা	১১ - ৩৬
জীবন দক্ষতা, প্যারেন্টিং, স্বদেশ-প্রেম, শিশু অধিকার এবং শিশু অধিকার আইন বুলিং, সাইবার বুলিং, এর প্রভাব ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা বাল্যবিবাহ এবং বাল্যবিবাহের প্রভাব বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু, অটিস্টিক শিশু	৩৭ - ৪৯
জেন্ডার বৈষম্য, জেন্ডার বৈষম্যের মানসিক প্রভাব এবং প্রতিকার যৌন হয়রানি, প্রভাব এবং প্রতিকার মনোসমাজিক সহায়তার দক্ষতা (সহমর্মীতা, মনোযোগী শ্রবণ)	৫০ - ৬০
মনোসমাজিক সহায়তার দক্ষতা (মূল্যবোধ, নিরপেক্ষতা, নৈতিকতা) মনোসমাজিক সহায়তার প্রক্রিয়া আত্মপরিচর্যা, কেসসমূহ	৬১ - ৭২
রেফারেল সিস্টেম	৭৩ - ৭৯

স্বাস্থ্য

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে (১৯৪৮), স্বাস্থ্য শুধু রোগ বা দুর্বলতার অনুপস্থিতিই নয় বরং এমন একটি অবস্থা যেখানে পরিপূর্ণ শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতা বিদ্যমান।

মানসিক স্বাস্থ্য

মানসিক স্বাস্থ্য হলো এমন একটি অবস্থা যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করতে পারে, জীবনের দৈনন্দিন চাপকে মোকাবেলা করতে পারে, উৎপাদনশীলভাবে কাজ করতে পারে এবং তার সমাজে অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

মনোসামাজিক সহায়তা

এটি এমন এক ধরনের সেবা, যার দ্বারা মানুষ আত্মসচেতন হওয়ার মাধ্যমে নিজের আচরণ ও মনোভাবের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়।

মনোসামাজিক সহায়তাকারী

মনোসামাজিক সহায়তাকারী সাধারণত মনোবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে অথবা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মনোসামাজিক কাউন্সেলরের কাছ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। তারা নিজের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন মনোসামাজিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন। মনোসামাজিক সহায়তাকারী প্রাথমিকভাবে ক্লায়েন্টকে সহায়তা করতে পারেন এবং ক্লায়েন্টের প্রয়োজন অনুযায়ী রেফার করতে পারেন। এক্ষেত্রে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মনোসামাজিক কাউন্সেলরের কাছ থেকে নিয়মিত সুপারভিশন একটি অপরিহার্য বিষয়।

মনোসামাজিক শিক্ষা

মনোসামাজিক শিক্ষা হলো এমন এক ধরনের শিক্ষণ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তির আকস্মিক বিপর্যয়, বিপত্তি, উৎপীড়ন, নিপীড়নের ফলে যে মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে ও স্বাভাবিক জীবনে মানিয়ে নিতে সহায়তা করে। মনোসামাজিক শিক্ষা ব্যক্তিকে তার প্রাত্যহিক জীবনে স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সহায়তা করে এবং পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত করে।

মনোসামাজিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

কিশোর-কিশোরীরা দিনের একটি বড় সময় বিদ্যালয়ে কাটিয়ে থাকে। তাই বিদ্যালয় হতে পারে একটি উপযুক্ত স্থান যেখানে কিশোর-কিশোরীদের মনোসামাজিক শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব। মনোসামাজিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিম্নে আলোচিত হলো-

- সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়ার জন্য বিশ্বস্ত কারো সাথে মনের কথাগুলো শেয়ার করে মানসিক চাপ, রাগ, ভীতি ইত্যাদি কমানো ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করা

- বাল্যবিবাহ, যৌন নির্যাতন, সাইবার বুলিং, শিশু অধিকার ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কারণে সৃষ্ট মানসিক অবস্থা নিয়ে কথা বলার মতো একটি নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা
- আজকের কিশোর-কিশোরীরা ভবিষ্যতে জাতিকে নেতৃত্ব দিবে। কাজেই তাদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা অপরিহার্য এবং মনোসামাজিক শিক্ষা কিশোর-কিশোরীদের সক্ষম ব্যক্তিত্বে পরিণত করবে

মনোসামাজিক সহায়তাকারীর গুণাবলি

মনোসামাজিক সহায়তাকারী যে ধরনের সেবা দিয়ে থাকেন তার জন্য বিশেষ কিছু গুণাবলি থাকা অত্যন্ত দরকার। কারণ মনোসামাজিক সহায়তাকারীকে মানুষের অত্যন্ত কাছাকাছি গিয়ে কাজ করতে হয়।

একজন মনোসামাজিক সহায়তাকারীর গুণাবলি-

- মনোযোগী শ্রবণ
- বিশ্বাসযোগ্যতা
- গোপনীয়তা রক্ষা করা
- সহনশীলতা
- সহমর্মীতা
- নিরপেক্ষতা
- অকৃত্রিমতা
- হাস্যরস বোধ
- শর্তহীনভাবে গ্রহণ করার ক্ষমতা
- আত্মসচেতনতা
- নমনীয়তা ও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা

মূলবার্তা : স্বাস্থ্য হলো শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে সুস্থ থাকা। মানসিক স্বাস্থ্য সম্বলিত ব্যক্তি তার দক্ষতাকে, সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে যেকোনো পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করতে পারে। মনোসামাজিক সহায়তা ব্যক্তিকে তার আচরণ ও মনোভাবের কাঙ্খিত পরিবর্তন আনতে সহায়তা করে। আমাদের জীবনে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা হলে, দৈনন্দিন উদ্বেগের সাথে খাপ খাওয়ানো ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমস্যা হলে কখনো কখনো মনোসামাজিক সহায়তা গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে। মনোসামাজিক সহায়তাকারীরা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, দক্ষতা ও গুণাবলি প্রয়োগের মাধ্যমে সেবা প্রদান করে থাকেন।

বয়ঃসন্ধিকাল কী ও কখন শুরু হয়

একটি শিশু জন্মের পর থেকেই ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। একটা বয়সে হঠাৎ তার মধ্যে কিছু পরিবর্তন দেখা যায় যেমন - বেশ লম্বা হওয়া, গলার স্বর পরিবর্তন হওয়া, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় চুল গজানো, অধিক স্বাধীনচেতা মনোভাব, অধিক দায়িত্ব অন্বেষণ করা, ঝুঁকি-গ্রহণমূলক আচরণ ইত্যাদি। এইসময় তাদেরকে ছোটদের দলে ফেলা যায় না আবার বড়দের দলেও ফেলা যায় না। এই সময়টাকেই বয়ঃসন্ধিকাল বলে।

সাধারণত ১০ থেকে ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত সময়টাকে বয়ঃসন্ধিকাল হিসেবে ধরা হয়।

কৈশোরকালীন শারীরিক পরিবর্তন

কৈশোরকালে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে কিছু শারীরিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এই বয়সে এ সকল শারীরিক পরিবর্তন তাদের মানসিক অবস্থার উপরও প্রভাব ফেলে, ফলে তাদের মধ্যে নানা ধরনের মানসিক পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়। নিম্নের টেবিলে বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে এবং মেয়েদের শারীরিক পরিবর্তনগুলো দেয়া হলো।

কিশোর-কিশোরী বয়সে ছেলে এবং মেয়েদের শারীরিক পরিবর্তন (physical change)

মেয়েদের	ছেলেদের
• শরীরের উচ্চতা ও ওজন বাড়ে	• শরীরের উচ্চতা ও ওজন বাড়ে
• কোমর সরু হয় এবং নিতম্ব ভারী ও চওড়া হয়	• কাঁধ চওড়া হয়
• মুখে ব্রণ হতে পারে	• স্বর পরির্বতন হয় (মোটা হয়)
• বগলে এবং যৌনাঙ্গের চারপাশে লোম গজায়	• মুখে ব্রণ হতে পারে
• স্তন বড় হতে থাকে, ব্যথা অনুভূত হয় এবং স্তনের বোটার চারপাশের রং গাঢ় হয়	• মুখে দাড়ি গোঁফ উঠতে থাকে
• যৌনাঙ্গ বড় হয় এবং পূর্ণতা পায়	• বগলে এবং যৌনাঙ্গের চারপাশে লোম গজায়
• মাসিক শুরু হয়	• অন্ডকোষ ও পুরুষাঙ্গ বড় হয় এবং পূর্ণতা পায়
	• কখনো কখনো ঘুমের মধ্যে বীর্যপাত (স্বপ্নদোষ)

মাসিক বলতে কী বোঝায়

সাধারণত ১১-১৩ বছর বয়সের মেয়েদের প্রতিমাসে জরায়ু থেকে একবার রক্তক্ষরণ হয়। এই রক্তক্ষরণ সাধারণত ৩-৫ দিন স্থায়ী হয়। কারও কারও ৭ দিনও থাকতে পারে। প্রতি মাসে হয় বলে একে মাসিক বলা হয়। মাসিক মেয়েদের জন্য একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।

প্রতিটি মেয়ের জন্যই মাসিক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মাসিক হওয়া না হওয়ার সাথে সন্তান ধারণের সম্পর্ক রয়েছে। কারও মাসিক হলে সে সন্তান জন্ম দেয়ার ক্ষমতা অর্জন করেন। কেউ গর্ভবতী হলে তার মাসিক বন্ধ থাকে। তবে অন্য কোনো কারণেও মাসিক বন্ধ থাকতে পারে। তবে মাসিক বন্ধ থাকলে বা সময়মতো না হলে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে হবে।

মাসিক কেন ও কীভাবে হয়

মেয়েদের তলপেটের ভিতরে প্রজনন অঙ্গগুলো মাসিক প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। অঙ্গগুলো হলো জরায়ু-১টি, ডিম্বনালী-দুইটি, ডিম্বথলি- দুইটি ও যোনিপথ। মাসিক হরমোনের প্রভাবে হয়। হরমোন এক ধরনের তরল পদার্থ যা শরীরের বিভিন্ন নালীহীন গ্রন্থি থেকে বের হয়ে সরাসরি রক্তে প্রবেশ করে। রক্তের মাধ্যমে এই হরমোন নির্ধারিত অঙ্গের উপর কাজ করে শরীরের বিভিন্ন ধরনের পরির্বতন ঘটায়। মেয়েদের স্তনের গঠন, মাসিক এবং সার্বিক আচার-আচরণ হরমোনের প্রভাবে হয়। মেয়েদের মস্তিষ্কে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে হরমোন নিঃসৃত হয়। এ হরমোন ডিম্বাশয়ের উপর কাজ করে। একটি হরমোন ডিমকে পরিপক্ব করতে সহায়তা করে অন্যটি ডিম বের করতে সহায়তা করে। এদিকে ডিম পরিপক্ব হওয়ার

সময় এবং পরে ডিম্বাশয় থেকে আরো দুইটি হরমোন তৈরি হয় যা নিষিক্ত ডিমকে জরায়ুতে ধরে রাখার পরিবেশ তৈরি করে এবং জরায়ুর ভিতরে রক্তের আস্তরণ তৈরি করে। কিন্তু ডিম নিষিক্ত না হলে ডিম্বাশয়ে হরমোন তৈরি বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় জরায়ুর ভিতরে যে রক্তের আবরণ তৈরি হয়েছিল তার ভাঙ্গন ঘটে। এ ভাঙ্গনকেই মাসিক বলে।

▶ মাসিক ব্যবস্থাপনা

- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে, নিয়মিত গোসল করতে হবে
- কাপড় ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই পরিষ্কার নরম কাপড় ব্যবহার করতে হবে। এই কাপড় দিনে কমপক্ষে চার বার পরিবর্তন করতে হবে
- মাসিকের সময় ব্যবহারের কাপড় সাবান এবং পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে কড়া রোদে শুকাতে হবে
- যদি সম্ভব হয় মাসিকের সময় স্বাস্থ্যসম্মত ন্যাপকিন অথবা তুলার প্যাড ব্যবহার করতে হবে
- তলপেটে ব্যথা হলে গরম পানির শেক দেয়া যেতে পারে। ব্যথা বেশি অথবা ভালো না হলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে
- মাসিকের সময় নিজেকে অপবিত্র বা অপয়া মনে করার কোনো কারণ নেই। ঐ সময় স্বাভাবিক কাজকর্ম করা যায়
- কুচকিতে (উরুর ফাঁকে) ঘা হলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। দুই-একদিনের মধ্যে ঘা ভালো না হলে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে
- তবে যেকোনো শারীরিক সমস্যা হলেই ডাক্তারের কাছে যেতে হবে

মাসিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ভিডিও : **https://www.youtube.com/watch?v=bl8vaEUevr0&t=276s**

▶ কৈশোরকালীন মনোসামাজিক পরিবর্তন

কৈশোরকালীন সময়ে কিশোর-কিশোরীদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পরিবার, বন্ধু এবং সমবয়সিদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও নানা ধরনের ভিন্নতা প্রকাশ পায়। কারণ, প্রত্যেক কিশোর-কিশোরীর মনোসামাজিক বিকাশ ভিন্ন; এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে জিনগত বৈশিষ্ট্য, মস্তিষ্কের বিকাশ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও চারপাশের পরিবেশ (পরিবার, বন্ধু, সমাজ, কৃষ্টি) ইত্যাদিও বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

মনোসামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের মাঝে আত্ম-নির্ভরশীলতা এবং পরিণত বয়সের বৈশিষ্ট্যগুলো ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়।

সামাজিক পরিবর্তনসমূহ

- ব্যক্তিগত পরিচয় অনুসন্ধান করা
- অধিক স্বাধীনচেতা মনোভাব
- অধিক দায়িত্ব অন্বেষণ করা
- ঝুঁকি-গ্রহণমূলক আচরণ
- সম্পর্কজনিত বিষয়

আবেগজনিত/আবেগীয় পরিবর্তনসমূহ

- নিম্ন আত্মসম্মান বোধ
- আবেগীয় সমস্যা (অত্যধিক রাগ, নিরাপত্তাহীনতা, উদ্বেগ, চাপ, হতাশা, বিষণ্নতা)
- প্রত্যাহারমূলক মনোভাব
- বিদ্রোহী আচরণ

▶ সামাজিক পরিবর্তন

ব্যক্তিগত পরিচয় অনুসন্ধান করা

এই বয়সে কিশোর-কিশোরীরা অন্যের কাছে কীভাবে নিজেদের পরিচয় তুলে ধরবে সে ব্যাপারে অধিক সচেতন থাকে। এই সময়ে তাদের মনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জাগে; যেমন- 'আমি কে?' 'আমি কী করতে পারি?' এই বয়সে তারা তাদের "লিঙ্গভিত্তিক" পরিচয় সর্ম্পকেও সচেতন হয়। যেহেতু এটি একটি পরিবর্তনশীল (Transition) পর্যায়, তাই এই সময়ে অনেকে আত্মপরিচয় সংকটে ভোগে। কারণ, সমাজ তাদের কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা প্রত্যাশা করে। কিন্তু প্রতিটি কিশোর-কিশোরীর নিজস্ব কিছু চাহিদা থাকে। কাজেই সমাজের প্রত্যাশিত চাহিদাগুলো পূরণ করতে গিয়ে কিশোর-কিশোরীরা কিছু সংকটে ভোগে।

স্বাধীনচেতা মনোভাব

এই বয়সে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে স্বাধীনচেতা মনোভাব গড়ে ওঠে। ভবিষ্যতে তাদের পেশা, পারস্পরিক সম্পর্ক, পরিবার পরিজন ইত্যাদি কেমন হতে পারে; সে সম্পর্কে ভাবতে শুরু করে। প্রতিটি কিশোর-কিশোরী ভবিষ্যতে সমাজে তার একটি স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরি করার কথা চিন্তা করে। এই সময়ে অনেক কিশোর-কিশোরী তাদের স্বাধীনতার অপব্যবহার করতে পারে, যেমন- কিশোর অপরাধে জড়িত হওয়া, মাদকাসক্ত হওয়া ইত্যাদি। এই সময়ে কিশোর-কিশোরীদেরকে তাদের বয়সোপযোগী স্বাধীনতা প্রদান করা হলে ভবিষ্যতে তারা স্বনির্ভরশীল ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। অপরদিকে অধিক রক্ষণশীল পরিবারে বেড়ে ওঠা এবং কম স্বাধীনতা প্রাপ্ত কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে স্বনির্ভরশীলতা ও আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি দেখা দিতে পারে।

অধিক দায়িত্ব পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা

কৈশোরকালীন সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো দক্ষতা শেখা যা তাদেরকে ভবিষ্যতে নিজের জীবন ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করে এবং তাদেরকে অধিক দায়িত্বশীল করে গড়ে তোলে। এই দায়িত্ববোধ তৈরি হওয়ার পেছনে পরিবার ও সমাজের অন্যান্য সদস্যরা মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এই বয়সে কিশোর-কিশোরীরা নিজেদের বাড়ি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন দায়িত্ব গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়। যে সকল কিশোর-কিশোরীরা পরিবার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব পালনের সুযোগ পায়, পরবর্তীতে তাদের মধ্যে নেতৃত্বমূলক গুণাবলির বিকাশ ঘটে।

ঝুঁকি-গ্রহণমূলক আচরণ

এটি এমন একটি সময় যখন কিশোর-কিশোরীরা অধিকতর চ্যালেঞ্জিং কাজের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে যা অনেক ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ। তারা অনেক ক্ষেত্রেই সীমা অতিক্রম করে ফেলে এবং পরিণতির কথা চিন্তা না করেই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ সম্পাদনের চেষ্টা করে। যেমন- অনেক কিশোর-কিশোরীর মধ্যেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উচ্চগতিতে মোটরবাইক কিংবা গাড়ি চালানোর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে রোমাঞ্চকর অনুভূতি উপভোগ করার জন্য এমন অনেক কাজ করে যেখানে জীবনের ঝুঁকি থাকতে পারে।

সম্পর্কজনিত বিষয়াবলি

কৈশোরকালে চিন্তামূলক ও আবেগীয় পরিপক্বতা লাভের ফলে সম্পর্কের ধরনে পরিবর্তন হয়। সম্পর্কের এই ধরনের পরিবর্তন পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব, শিক্ষক-শিক্ষিকা সকলের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। চিন্তনমূলক বিকাশের ফলে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে অন্যের চাহিদা, প্রত্যাশা, অনুভূতি বোঝার ক্ষমতা বেড়ে যায়। আবেগীয় পরিপক্বতা লাভের ফলে তারা অধিক আন্তরিক ও বিশ্বস্ত সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। এ সময়ে কিশোর-কিশোরীরা তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিজের মতামতকে প্রাধান্য দিতে চায় যা অনেক পিতামাতা মেনে নিতে চান না, ফলে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দের সৃষ্টি হয়। অনেক কিশোর-কিশোরী তার নিজের পরিবারের সদস্যদের সাথে ঔদ্ধত্যমূলক আচরণ প্রকাশ করে থাকে।

এ সময় বন্ধুদের সাথে অধিক আন্তরিক ও বিশ্বস্ত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এমন অনেক বিষয় আছে যা পিতামাতার সাথে আলোচনা করতে পারে না কিন্তু বন্ধুদের সাথে খুব সহজেই আলোচনা করতে পারে।

▶ আবেগীয় পরিবর্তন

আত্মসম্মানবোধ

আত্মসম্মানবোধ হলো একজন ব্যক্তির নিজস্ব গুণাবলি, যোগ্যতা, দক্ষতা ইত্যাদি সম্পর্কিত আত্মমূল্যায়ন। আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে ধারণা পোষণ করে। তারা মনে করেন যে, তারা যোগ্য ব্যক্তি এবং জীবনে অন্যদের ভালোবাসা ও সমর্থন পাওয়ার যোগ্য। এ ধরনের ব্যক্তির পক্ষে জীবনে সফলতা অর্জন করা সহজ হয়।

অপরপক্ষে নিম্ন আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন ব্যক্তির নিজের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে। তারা মনে করেন তারা অন্যের ভালোবাসা ও সমর্থন পাওয়ার অযোগ্য। এই ধরনের মানুষের পক্ষে বা এ ধরনের ব্যক্তির পক্ষে জীবনে সফলতা অর্জন করা কষ্টকর। কিশোর বয়সে অনেক ছেলেমেয়েদের মধ্যে নিম্ন আত্মসম্মানবোধ পরিলক্ষিত হয়। তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখা যায় :

- নিজের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করা, যেমন : নিজেকে অসুন্দর, অপছন্দনীয়, অযোগ্য ইত্যাদি মনে করা
- নিম্ন আত্মসম্মানবোধে ভোগা
- নতুন বন্ধুত্ব তৈরি করা ও বজায় রাখার ক্ষেত্রে নিজেকে অযোগ্য মনে করা
- নিজেকে অন্যের দ্বারা নিপীড়িত মনে করা
- নতুনত্ব এড়িয়ে চলা, পরিবর্তনকে সহজে মেনে নিতে না পারা
- নিম্ন আত্মবিশ্বাসে ভোগা, কোনো কাজ শুরু করার আগেই নিজেকে অপারগ মনে করা
- নিজের প্রাপ্তিকে সার্বিকভাবে মূল্যায়ন না করা এবং সব সময় মনে করা, আরো ভালোভাবে কাজটি সম্পাদন করা যেত
- সর্বদা নিজেকে বন্ধুদের সাথে তুলনা করা এবং নিজেকে বন্ধুদের চাইতে কম যোগ্যতাসম্পন্ন মনে করা

আবেগীয় সংকট

কৈশোরকাল এমন একটি সময় যখন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের কারণে কিশোর-কিশোরীরা বিভিন্ন আবেগীয় সমস্যা অনুভব করে; যেমন-অত্যধিক রাগ, নিরাপত্তাহীনতা, উদ্বেগ, চাপ, হতাশা, বিষণ্নতা। এ সময়ে কিশোর-কিশোরীরা

শিশুদের পর্যায়ে পড়ে না; আবার বড়দের পর্যায়েও পড়ে না। ফলে নিজেদের সামাজিক অবস্থান নিয়ে তারা সবসময় শংকিত থাকে। তাদের কাছ থেকে সমাজের কিছু প্রত্যাশা থাকে, কিন্তু সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত কোনো আচরণবিধি না থাকায় তারা তাদের আচরণ নিয়ে সব সময় নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে ও উদ্বিগ্ন থাকে।

মনের কথাগুলো কারও সাথে খোলাখুলি আলোচনা করতে না পারার ফলে মানসিক চাপ বোধ করে। তাদেরকে সঠিকভাবে বুঝতে না পারার কারণে প্রায়ই অতিরিক্ত রাগান্বিত হয়ে পড়ে। কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে কঠোরতা, সংকীর্ণতা, আত্মকেন্দ্রিকতা পরিলক্ষিত হয়। শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পনের পরেও কিশোরদের মধ্যে আদর পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা রয়ে যায়, কিন্তু পরিবার ও সমাজের কাছ থেকে তারা আগের মতো আদর ও মনোযোগ না পাওয়ায় বিষণ্নতায় ভোগে। কিশোর-কিশোরীরা সমাজে অনেক সময় সাহসী ভূমিকা পালন করতে চায়, কিন্তু বয়সে ছোট হওয়ার কারণে সব ধরনের কাজ করার অনুমতি তারা পায় না। ফলে তাদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হয়।

প্রত্যাহারমূলক মনোভাব

কৈশোরকালীন প্রত্যাহারমূলক মনোভাব বলতে বোঝায় একাকী থাকা, নিজেকে সামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে গুটিয়ে নেয়া, নিজের কাজে মগ্ন থাকা ইত্যাদি। এই সময়ে শারীরিক পরিবর্তনের কারণে অধিকাংশ কিশোর-কিশোরীরা আশেপাশের মানুষদের কাছ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিতে চায়। তাদের এই শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনগুলো তারা খোলামেলাভাবে কারো সাথে আলোচনা করতে পারে না। পোশাক পরিচ্ছদে পরিবর্তন আসার কারণে তারা জনসম্মুখে যেতেও ইতস্ততবোধ করে। কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে এক ধরনের উদ্বিগ্নতা কাজ করে কারণ তারা মনে করে আশেপাশের সবাই তাদেরকে লক্ষ্য করছে।

বিদ্রোহী আচরণ

কিশোর-কিশোরীদের অবাধ্য আচরণ বলতে তাদের এমন কতগুলো আচরণকে বোঝায় যা সমাজের প্রথাগত আদর্শের ব্যতিক্রম। এসময়ে কিশোর-কিশোরীরা অধিক স্বাধীনতা অন্বেষণ করে এবং নিজের পছন্দমতো কাজ করতে চায়; যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজের আদর্শ ভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিদ্রোহমূলক আচরণ কিশোর-কিশোরীদের বিকাশকালীন একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য যা সাধারণত দুইভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে :

- সমাজ বিরোধী আচরণের মাধ্যমে
- বড়দের প্রতি বিদ্রোহমূলক আচরণের মাধ্যমে

এই অবাধ্য আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে স্কুল পালানো, মাদকসেবন, শিক্ষককে শ্রদ্ধা না করা, বন্ধুদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে।

কিশোর-কিশোরীদের বিদ্রোহমূলক আচরণের কিছু সম্ভাব্য কারণ নিম্নে দেয়া হলো :

- আত্মপরিচয় সম্পর্কে সচেতনতা
- স্বনির্ভরশীল হওয়ার প্রবণতা
- মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা
- বন্ধুদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া
- হরমোনজনিত পরিবর্তন

কৈশোরকালীন মনোসামাজিক জটিলতাসমূহ

সহপাঠীর প্রভাব

কৈশোরকালে সামাজিক এবং মানসিক উন্নয়নে তার সহপাঠীর প্রভাব অপরিসীম। এই প্রভাব শৈশবেই শুরু হয় এবং কিশোর বয়সে এর ব্যাপ্তি আরো বেড়ে যায়। একজন কিশোর-কিশোরীর জন্য তার বেড়ে ওঠার সাথে সাথে তার সহপাঠীর উপর নির্ভরশীলতা তৈরি হওয়া একটি সুস্থ, স্বাভাবিক এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। যখন একজন কিশোর-কিশোরী তার সহপাঠীকে অনুসরণ করতে গিয়ে তার নিজের ইচ্ছা এবং আচরণের অনুরূপ পরিবর্তন করে সেই মুহূর্তে সেই কিশোর-কিশোরীর জীবনে তার সহপাঠীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সে সহপাঠীর অনুকরণে কাজ করে কারণ তারা মনে করে তারা যদি এমনটি না করে তখন অন্যান্য সহপাঠীরা তাকে নিয়ে হাসি তামাশা করবে। সহপাঠীর প্রভাব ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয়ই হতে পারে। সহপাঠীর ইতিবাচক প্রভাবে একজন কিশোরের মধ্যে বিভিন্ন অনুকরণমূলক দক্ষতা যেমন : বই পড়া, গান শোনা ইত্যাদি বৃদ্ধি পেতে পারে। অপরদিকে সহপাঠীর নেতিবাচক প্রভাবে একজন কিশোরের মধ্যে বিভিন্ন ঝুঁকিমূলক আচরণ বৃদ্ধি পায়। যেমন : ক্লাস ফাঁকি দেয়া, চুরি করা, ধোঁকাবাজি, ধূমপান ইত্যাদি। অনেক কিশোর-কিশোরী তার সহপাঠীর প্রভাবের ফলেই/চাপে পড়েই মদ্যপান এবং ধূমপান শুরু করে।

পড়ালেখায় ব্যাঘাত

অধিকাংশ কিশোর-কিশোরী তাদের সহপাঠীর কাছে কাজের স্বীকৃতি পাওয়ার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকে, কিন্তু কিছু কিশোর সামাজিকভাবে তার সহপাঠীদের মতো আচরণ না করার ফলে তাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়। সহপাঠীদের দ্বারা বুলিং এবং সামাজিক প্রত্যাখ্যানের মাত্রা যদি বেড়ে যায় তাহলে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে নেতিবাচক আচরণের মাত্রা বেড়ে যায়। যার ফলশ্রুতিতে তার পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হয় এবং এতে সে পর্যাপ্ত নম্বর অর্জন করতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে এসব নেতিবাচক প্রভাবের ফলে সে তার সহপাঠীদের সাথে যথার্থ আচরণ করতে পারে না এবং তার চেয়ে বয়সে ছোট অথবা বড় যে কারো সাথে সে মেলামেশা শুরু করে যে তার অপরিপক্ক আচরণগুলোকে গ্রহণ করে নেয়। এ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, একাডেমিক, সামাজিক এবং পারিবারিক বাধা একজন কিশোরের জীবনকে কতটা দুর্বিষহ করে তুলতে পারে। এসব বাধার ফলে তারা হীনমন্যতায় ভোগে এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশায় পড়ে যায়। এছাড়া কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক, মাদক সেবন এবং অন্যান্য আক্রমণাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ বৃদ্ধি পায়।

যোগাযোগের অভাব

একটি শিশু যখন কৈশোরে পদার্পন করে, তখন তার মধ্যে অনেক আশা এবং উদ্দীপনা যেমন থাকে তেমনি কিছুটা ভীতিও কাজ করে। কৈশোরকাল এমন একটি সময় যখন একটি ছেলে অথবা মেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখে, নিজের আত্মপরিচয় লাভ করে এবং নিজেকে ভবিষ্যতে একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে। কৈশোরকালীন সময়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে যে দুইটি বিষয়ে তারা বেশি সচেতন হয়ে ওঠে তা হলো- অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নিজস্ব স্বত্তা গঠন। সন্তানের কৈশোরকাল বাবা-মায়ের জন্যও একটি পরিবর্তনের সময়। কৈশোরকালে কিশোর-কিশোরীরা স্বাধীনভাবে নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চায়। এসব ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় তারা বড়দের পরামর্শ বা সমর্থন পায় না। এছাড়া অনেক পরিবার এ সময়ে তাদের ছেলে-মেয়েদের সাথে খোলামেলাভাবে কথা বলতে সংকোচবোধ করে। কিছু বাবা-মা এ সময়ে সন্তানদের সাথে আলোচনা না করে যেকোনো ধরনের সিদ্ধান্ত তাদের উপর চাপিয়ে দেয়। এমন সময় কিছু ছেলে-মেয়েরা এতটাই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে যে তারা বাবা-মায়ের যথার্থ উপযুক্ত সিদ্ধান্তকেও মেনে নিতে পারে না এবং বাবা-মায়ের বিরোধীতা করে। এভাবেই সঠিক যোগাযোগের অভাবেই বাবা-মা এবং সন্তানের মধ্যে এ দূরত্বের সৃষ্টি হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক সফলতা অর্জনে জটিলতা

কিশোর বয়সে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন দেখা যায়। তাদের মধ্যে আবেগীয় পরিবর্তন খুব বেশি পরিলক্ষিত হয়। পরিবার, সমাজ, বন্ধু-বান্ধবের সাথে তাদের আচরণে পরিবর্তন আসে যা তাদের শিক্ষার উপর প্রভাব বিস্তার করে। নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করে তারা। বিভিন্ন পরিবর্তনের কারণে নিজেকে কখনও বড়দের মতো আবার কখনও ছোটদের মতো প্রকাশ করতে চায়। এই ধরনের পরিবর্তন তাদের মধ্যে চাপ, দ্বন্দ্ব, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি সৃষ্টি করে। পরিবার ও সমাজ তাদের প্রতি প্রত্যাশা বাড়িয়ে দেয়। একজন ছেলে বা মেয়ে শৈশবে যে ফলাফল অর্জন করত, কৈশোরকালীন পরিবর্তনের ফলে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক ফলাফলে পরিবর্তন চলে আসতে পারে। বাবা-মা, শিক্ষক-শিক্ষিকা এই ধরনের পরিবর্তন সহজে মেনে নিতে পারেন না; ফলে ছেলেমেয়েদেরকে অনেক সময় বকাঝকা করেন।

ফলে অনেক শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার প্রতি অনীহা চলে আসে এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভালো ফলাফল ধরে রাখা কষ্টকর হয়ে যায় তাদের জন্য। অনেক কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে অন্যের মনোযোগ লাভের প্রবণতা দেখা যায়। শ্রেণিতে ভালো অবস্থান ধরে রাখার জন্য অনেকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করা শুরু করে। সব কিছুতেই সর্বোত্তম অবস্থান ধরে রাখতে গিয়ে নিজের প্রতি যত্নের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ে। অত্যধিক চাপের কারণে অনেকেই শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

মাদক গ্রহণ ও অন্যান্য আসক্তি

কিশোর বয়সের একটি বড় জটিলতা হলো আসক্তি। বন্ধু-বান্ধবের চাপে, পারিবারিক অশান্তি, অগ্রহণযোগ্যতা, হীনমন্যতা, হতাশা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে কিশোর-কিশোরীরা অনেক সময় মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। ধূমপান, অ্যালকোহল আসক্তি, মাদক গ্রহণ, পর্ণোগ্রাফি, ঝুঁকিপূর্ণ যৌন সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদির প্রতি অনেক কিশোর-কিশোরী আসক্ত হয়ে পড়ে যা তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে তুলতে পারে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণে জটিলতা

কিশোর বয়সের অন্যতম জটিলতা হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণে জটিলতা। পড়াশুনা, ক্যারিয়ার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অনেকেই সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। উদাহরণস্বরূপ- নবম শ্রেণিতে উঠে একজন ছাত্র/ছাত্রী বিজ্ঞান, মানবিক কিংবা ব্যবসায় কোন বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করবে, ভবিষ্যতে কোন পেশায় নিয়োজিত হবে, এসব বিষয় নিয়ে অনেক সময় বাবা-মা ও সন্তানের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং সন্তান সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। অনেক সময় বন্ধু-বান্ধব নির্বাচন করার ব্যাপারেও তারা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। এই বয়সে শারীরিক পরিবর্তনের কারণে পোশাক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও কিশোর-কিশোরীদের সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে দেখা যায়।

এই বয়সে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে আরও কিছু মনোসামাজিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তনগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

বয়ঃসন্ধিকাল সম্পর্কিত ভিডিও : https://www.youtube.com/watch?v=J_9Ql071BOc

মূলবার্তা : বয়ঃসন্ধিকাল জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। বয়ঃসন্ধিকাল জীবনে নির্দিষ্ট সময়ে আসে এবং এই সময়ে ছেলে-মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে কিছু শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন হয়। এই বয়সে ছেলে-মেয়েরা তাদের শারীরিক সৌন্দর্য নিয়ে খুব বেশি সচেতন থাকে, যার ফলে কারো কারো মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ পরিলক্ষিত হয়। তার মধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাল্পনিক বিকৃতি সম্পর্কিত ব্যাধি একটি। এটি যথাযথ চিকিৎসার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা সম্ভব।

প্রতিমাসে ১১-১৩ বছর বয়সি মেয়েদের একবার রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে। এটি প্রতিটি মেয়েদের জীবনে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা এই মাসিক প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। সঠিক মাসিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। এ বয়সে তাদের মধ্যে মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় যেমন- অত্যাধিক রাগ, উদ্বেগ, মানসিক চাপ, নিরাপত্তাহীনতা, হতাশা, বিষণ্নতা, আত্মকেন্দ্রিকতা ইত্যাদি।

শান্তি এবং সংঘর্ষ

আমরা আমাদের জীবনের বিভিন্ন ধাপে নানা ধরনের সংঘর্ষের সম্মুখীন হই। এই সংঘর্ষ ফলপ্রসূভাবে মোকাবিলা করা না হলে তা আমাদের জীবনে সফলতার পথে বাধা হয়ে দাড়ায়। সংঘর্ষ আমাদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ কারণ আমরা প্রতিটি মানুষ সব সময় কোনো একটি বিষয়ে একমত পোষণ নাও করতে পারি। যেহেতু সংঘর্ষ জীবনে থাকবেই তাই একে মোকাবেলা করার দক্ষতা সবারই থাকা প্রয়োজন। জীবনের অন্যান্য দক্ষতার মতো এটাও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা। আমাদের জীবনে বিদ্যমান সংঘর্ষগুলোকে প্রতিরোধ, মোকাবেলা করা এবং তীব্রতা কমিয়ে আনাকেই শান্তি বোঝায়।

শিশুরা নিজেদেরকে অনিরাপদ স্থানে আছে বলে বিবেচনা করে তাই তারা তাদের বন্ধুদের সাথে খুব সহজেই সংঘর্ষ জড়িয়ে পরে। কিশোর বয়সে কিশোর-কিশোরীরা তাদের আবেগ প্রকাশের জন্য অন্যকে উত্যক্ত করা, পরচর্চা করা এবং শারীরিক শক্তি প্রদর্শনকে বেছে নেয়। কিশোর-কিশোরীদেরকে সংঘর্ষ মোকাবেলার দক্ষতা শেখানো হলে সমাজ অনেক ধরনের সহিংসতা ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে রক্ষা পাবে। আমরা সংঘর্ষ মোকাবেলা করার দক্ষতা প্রয়োগ করার মাধ্যমে অনেক ধরনের উপকারিতা পেতে পারি। যেমন :

- কিশোর-কিশোরীরা কীভাবে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের নিরসন করবে সে সম্পর্কে জানতে পারবে।
- সর্বত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করবে
- লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে
- সম্পর্ক তৈরি এবং রক্ষা করতে সহায়তা করবে
- প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সহায়তা করবে
- ব্যক্তি তার নিজের মতামত প্রকাশের পাশাপাশি অন্যের মতামতের প্রতি সহনশীলতা ও সম্মান প্রদর্শনের মতো পরিবেশ তৈরি হবে
- ব্যক্তির জ্ঞান, দক্ষতা, ইতিবাচক মনোভাব বৃদ্ধি এবং আচরণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে যেকোনো সমস্যা সৃজনশীলতার সাথে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে
- বিপজ্জনক পরিস্থিতি শনাক্তকরণ এবং মোকাবেলা করার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে
- বন্ধুদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সহায়তা করবে
- সমাজের নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে অবদান রাখতে পারবে

চরমপন্থী আচরণ

চরমপন্থী আচরণ হলো দেশের প্রচলিত মূল্যবোধ, আইন, ব্যক্তি স্বাধীনতার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মৌখিক অথবা কাজের মাধ্যমে বিরোধিতা প্রকাশ করা। কিছু কিছু চরমপন্থী ব্যক্তি রয়েছে যারা কিনা সমাজে খুব ভঙ্গুর অবস্থায় থাকে, নিজেকে গুটিয়ে রাখে, এবং প্রতিদিনকার কাজ কর্মে অংশগ্রহণ করে না। এরা সাধারণত এদের রাগ, অপ্রাপ্তি, গভীর দুঃখ চরমপন্থী আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকে। যেমন-ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতি সহিংসতা, খুন ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা। চরমপন্থা তখনই হয় যখন কেউ সমাজের বেশিরভাগ লোককেই অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য মনে করে। চরমপন্থীরা প্রচন্ড রকম ভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী।

সহিংস চরমপন্থী আচরণ হলো যখন একজন ব্যক্তি অথবা দল তাদের মতাদর্শ, প্রত্যাশিত রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন আনয়নে ভয়ভীতি প্রদর্শন, অস্থিরতা এবং সহিংস আচরণ করে থাকে।

ধর্মীয় গোঁরামী হলো নিজের ধর্মের প্রতি/দলের প্রতি অদম্য নিষ্ঠা যা শুধু নিজের ধর্মের লোকদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ- চাকরির নিয়োগের ক্ষেত্রে নিজ ধর্মের লোককে প্রাধান্য দেয়া।

আত্মপরিচয়ের অভাব চরমপন্থীমূলক আচরণের সাথে সম্পর্কিত। এর ফলে ব্যক্তির মধ্যে আত্ম-ধ্বংসাত্মক আচরণ ও নিজের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে যা তার মধ্যে প্রতিশোধের অনুভূতি জাগ্রত করে ও নিজের মানবিকতাকে হত্যার দিকে পরিচালিত করে। চরমপন্থীতাকে না কোনো কৌশল হিসাবে, না কোনো একটি মতাদর্শ হিসাবে দেখা হয়, তবে এটাকে একটা অস্বভাবী ব্যাধি (Pathological Disorder) হিসেবে দেখা হয় যা জীবনের জন্য ধ্বংসস্বরূপ এবং এটা নিরাময়যোগ্য।

অন্য কথায় বলা যায়, চরমপন্থীতা হলো এক ধরনের আবেগীয় অবস্থা যা নিপীড়ন, নিরাপত্তাহীনতা, অপমান, অসন্তুষ্টি, ক্ষোভ এবং ক্ষোভের ধারাবাহিকতা থেকে উদ্ভুত যা ব্যক্তি বা দলের দ্বন্দ্বের সাথে সম্পর্কিত।

অনেক সময় সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য থেকে দূরে সরে যাবার কারণে কিশোর-কিশোরীরা নিজেদেরকে সমাজ বিচ্ছিন্ন বলে মনে করে। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব, নতুন ও উত্তেজনাপূর্ণ দলের প্রতি ঝোঁক, মনের মধ্যে নতুন বিশ্বাস ও বন্ধু নির্বাচন বিষয়ক নানা প্রশ্নের উদ্ভবের কারণেও এই ধরনের সহিংস আচরণের প্রতি আকর্ষণ বোধ করতে পারে। এছাড়াও এক দেশ থেকে অন্য দেশে বিতাড়িত, সামাজিক কোনো সংকট, নিজেকে অবিচারের স্বীকার বলে মনে করা এর পেছনে দায়ী।

কিশোর বয়সকে কেন্দ্র করে পরিবার ও সমাজে চরমপন্থীতার ক্ষতিকর দিক

কিশোর বয়সটা সাধারণত এই ধরনের আচরণের প্রতি ঝুঁকিপূর্ণ। কিশোর-কিশোরীদের এ ধরনের আচরণের ফলে তাদের পরিবার, সমাজ ও বন্ধু মহলে নানা ধরনের জটিলতা ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। যেমন :

তাদের মধ্যে নানা ধরনের বিকৃত, অসংলগ্ন এবং অযৌক্তিক চিন্তাভাবনা রয়েছে যা তারা সত্য, যৌক্তিক ও অপরিবর্তনীয় বলে মনে করে এবং তাদের সহনশীলতার মাত্রা কম থাকে। এজন্য তাদের অন্যদের সাথে বাগবিতন্ডা/দ্বন্দ্ব তৈরি হয়ে থাকে। তাদের জানাটা আসলে অনেক সীমিত, সেকেলে এবং এক তরফা তথ্য নির্ভর।

সাধারণত ধর্ম সম্পর্কে তাদের জ্ঞান খুব সীমিত। কোনো তথ্য ঐতিহাসিকভাবে, বৈজ্ঞানিকভাবে এবং যৌক্তিকভাবে বৈধ হলেও তারা তা মানতে চায় না। তারা কেবলমাত্র সে তথ্যগুলোই ধারণ করে বা বিশ্বাস করে যেগুলো তাদের চিন্তা-ভাবনার সাথে মিলে যায়। তারা সবকিছুকে 'ভুল-ঠিক' এভাবে বিচার করে থাকে, যেখানে কোনো নমনীয়তা, অভিযোজন ও বস্তুনিষ্ঠতার সুযোগ নেই। এজন্য তাদের ভিন্ন মতো পোষণকারীদের সাথে মিলেমিশে চলতে অসুবিধা হয়।

তারা এই ধারণা পোষণ করে যে, তারা অন্যকে আঘাত করা, ক্ষতি করা এবং ধ্বংস করার অধিকার রাখে। যা মূলত অন্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না। তাই কলহ লেগে থাকে।

কেউ কেউ অতীতের কিছু বিশ্বাস ও চালচলনকে আদর্শ হিসেবে ধরে নিয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যতে আদর্শ হিসেবে প্রয়োগ করতে চায়। অনেক সময় তারা কোনো বিষয় সম্পর্কে কোনো কিছু না জেনে সে সম্পর্কে অনেক বিকৃত ধারণা পোষণ করে থাকে। এ ধরনের মতাবলম্বী মানুষরা কারো সাথে সমঝোতায় আসতে চায় না। তারা অন্যদের সাথে নিজের কোনো রকম মিল খুঁজে পায় না এবং "তুমিও সঠিক, আমিও সঠিক" এ ধরনের সমঝোতায় যেতে চায় না।

এরা মৃত্যু পরবর্তী জীবন নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন থাকে। বর্তমান জীবনের ঐশ্বর্য্যের দিকে তারা একদম নজর দিতে চায় না। তারা মনের মধ্যে অনেক ধরনের মানসিক প্রতিরোধ তৈরি করে রাখে যাতে করে তাদের রক্ষণশীল ধারণাগুলো কখনও হুমকির সম্মুখীন না হয়। এরা প্রাত্যহিক জীবন উপভোগ করে না এবং পরিবার ও সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদাসীন থাকে যা পরিবারের সদস্যদের সাথে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করতে পারে।

সমাজ থেকে চরমপন্থীতা দূর করার উদ্দেশ্যে- কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি এমন কাউকে (চরমপন্থী) চিহ্নিত করেন তবে তার দায়িত্ব হলো তার সংগঠনের নির্দিষ্ট সুরক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছে তা জানানো, যারা এ বিষয় নিয়ে পুলিশের সাথে আলোচনা করবেন। এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট রেফারেল প্রক্রিয়ার ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

মূলবার্তা : সংঘর্ষ আমাদের জীবনের একটি অংশ। সংঘর্ষ মোকাবিলা করতে পারা একটি গুরুত্বপূর্ণ জীবন দক্ষতা। চরমপন্থীতা হলো শান্তির বিপরীত, যার ফলে সমাজে নানা ধরনেরর অশান্তি তৈরি হয়। সংঘর্ষ মোকাবিলা করার দক্ষতার দ্বারা ব্যক্তি তার মূল্যবোধ, মনোভাব ও আচরণে পরিবর্তন আনতে পারে। পাশাপাশি অন্যের মূল্যবোধ ও মনোভাবের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে কাঙ্খিত শান্তি আনয়ন করতে পারে।

▶ আবেগ ব্যবস্থাপনা

আবেগ

আবেগ হলো এক ধরনের মানসিক অবস্থা যা চিন্তন, অনুভূতি, আচরণগত প্রতিক্রিয়া এবং আনন্দ/বেদনার মাত্রার সাথে সম্পর্কিত। আবেগের ফলে আমাদের নানা রকম শারীরিক, আচরণগত এবং চিন্তার পরিবর্তন হয়।

মৌলিক আবেগ

- সুঃখ
- দুঃখ
- রাগ
- ভয়

কেন আবেগ ব্যবস্থাপনা করা গুরুত্বপূর্ণ

দৈনন্দিন জীবনে আমাদের অনেক নেতিবাচক ঘটনার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। ফলে আমরা নানা ধরনের আবেগীয় সংকটের সম্মূখীন হই, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কী করতে হবে, কীভাবে করতে হবে তা নিয়ে আমরা অনিশ্চয়তা ও দ্বিধায় ভুগি। আবেগ ব্যবস্থাপনা ব্যক্তিকে আত্মনিয়ন্ত্রণে সহায়তা করবে, নেতিবাচক পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে এবং এ ধরনের পরিস্থিতিতে কীভাবে প্রতিক্রিয়া করতে হবে তাতে সহায়তা করবে। ব্যক্তি তার গুণাবলিগুলো উপলদ্ধি করতে পারবে এবং ফলপ্রসূভাবে কাজ করতে পারবে। আত্মবিশ্বাস, আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এবং আত্মসম্মানবোধ বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

আবেগ ব্যবস্থাপনার কৌশল

- নিজের অনুভূতি, প্রতিক্রিয়া এবং মানসিক অবস্থার প্রতি খেয়াল করা এবং বোঝা
- নিজের অনুভূতি ও আচরণের দায়িত্ব নেওয়া
- নিজের সফলতার উপর ফোকাস করা এবং এর জন্য নিজেকে প্রশংসা করা
- প্রাকৃতিক পরিবেশে সময় অতিবাহিত করা
- মুক্ত মনা হওয়া ও চারপাশে যা ঘটছে তা গ্রহণ করা
- বিশ্বস্ত কারো সাথে মনের কথা শেয়ার করা
- পছন্দনীয় ইতিবাচক কাজ করা (পছন্দের বই পড়া, গান শোনা)
- ডায়েরি লেখা (ঘটে যাওয়া ঘটনা, নিজের চিন্তা ও অনুভূতি লেখা)
- জীবনের ইতিবাচক ঘটনার প্রতি ফোকাস করা
- ব্যায়াম করা
- নাক দিয়ে গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে মুখ দিয়ে প্রশ্বাস ছাড়া

মূলবার্তা : আবেগ হলো অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক ঘটনার প্রতি আমাদের শরীরবৃত্তীয় ও আচরণগত প্রতিক্রিয়া (Sternberg,R.1998)। ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে আবেগের বহিঃপ্রকাশ ভিন্ন হয়ে থাকে। আবেগের ব্যবস্থাপনার অদক্ষতার কারণে নানা ধরনের পরিস্থিতিতে আবেগীয় গোলযোগ দেখা যেতে পারে। আবেগ ব্যবস্থাপনার কৌশলগুলো অবলম্বনের মাধ্যমে ব্যক্তি এই গোলযোগ থেকে রক্ষা পেতে পারে।

▶ উদ্বেগ (Anxiety)

আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের (APA) এর মতে, "উদ্বেগ হলো এক ধরনের আবেগ যাকে তীব্র অনুভূতি, দুশ্চিন্তা এবং রক্তচাপ বৃদ্ধি করার মতো শারীরিক পরিবর্তনগুলো দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।"

স্বাভাবিক মাত্রায় উদ্বেগের অনুভূতি থাকা ভালো, যেটা ব্যক্তিকে কোনো বিপজ্জনক পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে প্রস্তুত ও সহায়তা করে। তবে উদ্বেগ বেশি মাত্রায় থাকলে ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর হয় ফলে ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবন যাত্রার মান ব্যাহত হয় এবং ব্যক্তির মানসিক অবস্থা হুমকির সম্মুখীন হয়।

উদ্বেগের লক্ষণ ও উপসর্গ

মানসিক লক্ষণ

- অত্যধিক রাগ
- বিরক্ত বোধ
- মনোযোগের অসুবিধা
- অস্থিরতা
- যেকোনো পরিস্থিতি খুব বিপজ্জনক মনে করা
- খারাপ কিছু ঘটবে বলে আশংকা
- নেতিবাচক চিন্তা

শারীরিক লক্ষণ

- হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া
- রক্ত চাপ বেড়ে যাওয়া
- বমি বমি ভাব
- ঘাম হওয়া
- মুখ শুকিয়ে যাওয়া
- ডায়রিয়া
- পেট ব্যথা, মাথা ব্যথা
- শ্বাস কষ্ট

আচরণগত লক্ষণ

- ঘুম না হওয়া বা ঘুমের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া
- পরিস্থিতি এড়িয়ে চলা

- খাবারে অরুচি বা অত্যধিক পরিমাণে খাবার গ্রহণ করা
- অলসতা বা অনীহা
- মাদক দ্রব্য গ্রহণ করা/মদ্যপান করা
- প্রত্যাহারমূলক আচরণ

উদ্বেগের কারণ

- চাহিদা ও যোগানের মধ্যে পার্থক্য থাকা
- অবাস্তব প্রত্যাশা
- আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাব
- প্রত্যাখ্যাত ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয়
- তুলনা করা
- কর্মক্ষেত্র ও স্কুলের কাজের চাপ
- ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্কের অবনতি
- অর্থনৈতিক সমস্যা
- অসুস্থতা
- নেতিবাচক অভিজ্ঞতা ইত্যাদি

মানসিক উদ্বেগ থেকে বের হয়ে আসার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় কিছু উপায় নিম্নে উল্লেখ করা হালা :

- নিজের চিন্তা, অনুভূতি ও আচরণের প্রতি খেয়াল করা এবং এগুলোর দায়িত্ব গ্রহণ করা
- বিশ্বস্ত কারো সাথে মনের কথা শেয়ার করা
- নিজেকে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি থেকে কিছু সময়ের জন্য দূরে রাখা যেমন- ১০-১৫ মিনিট হাঁটা, এক কাপ চা তৈরি করে খাওয়া, গোসল করা ইত্যাদি
- নিজের সাথে ইতিবাচক কথা বলা
- যে পরিস্থিতি বা ঘটনা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে তা মেনে নেওয়া
- পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমানো
- নিজের পছন্দের ইতিবাচক কাজ করা
- পুষ্টিকর খাবার খাওয়া
- ভালো স্মৃতি বা সফলতার কথা ভাবা
- নিজেকে পুরস্কৃত করা ও নিজের প্রশংসা করা
- দৃঢ়তার সাথে "না" বলতে শেখা
- ব্যায়াম করা
- নাক দিয়ে গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে মুখ দিয়ে প্রশ্বাস ছাড়া
- প্রয়োজনে মনোবিজ্ঞানীর শরণাপন্ন হওয়া

মূলবার্তা : নানা ধরনের আবেগের মধ্যে উদ্বেগ হলো একটি উল্লেখযোগ্য আবেগ। উদ্বেগের স্বাভাবিক উপস্থিতি ব্যক্তির জন্য ইতিবাচক। তবে বেশি মাত্রার উদ্বেগ ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়ে ক্ষতির কারণ হতে পারে। নানা কারণে একজন ব্যক্তির মধ্যে উদ্বেগ দেখা যেতে পারে। যথাযথ উদ্বেগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যক্তি শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে পারেন। কিশোর বয়স একটি পরিবর্তনশীল (Transition) পর্যায় যখন তার মধ্যে খুব দ্রুত মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বয়সন্ধিকালে সৃষ্ট উদ্বেগের ফলে কিশোর-কিশোরীদের নিম্ন আত্মসম্মান বোধ, অতিরিক্ত ভয়, প্রত্যাহারমূলক আচরণ, সামাজিক উদ্বেগ ইত্যাদি দেখা যায়। এছাড়াও তাদের মধ্যে আরো কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায় যেমন- বিদ্যালয়ে নিম্নমানের ফলাফল, স্কুল-কলেজ থেকে ঝরে পরা, মাদক দ্রব্য সেবন ইত্যাদি।

▶ সামাজিক উদ্বেগ

সামাজিক উদ্বেগ হলো অন্যদের চোখে বিচার হওয়ার এবং অন্যদের দ্বারা নেতিবাচকভাবে মূল্যায়িত হওয়ার ভয়। সামাজিক উদ্বেগে ভুগলে নিজেকে অযোগ্য বা অন্যদের তুলনায় ছোট মনে করে, নিজেকে নিয়ে অতিরিক্ত সচেতনতা, লজ্জা, অপমান এবং বিষণ্নতায় ভোগে।

সামাজিক উদ্বেগের লক্ষণ

১. ঘেমে যাওয়া
২. গলার স্বর কাঁপা
৩. দ্রুত হৃদস্পন্দন
৪. ঘুম ঘুম ভাব
৫. মনটাকে শূন্য মনে করা
৬. মাংসপেশীতে টান ভাব
৭. গাল লাল হয়ে যাওয়া
৮. সামাজিক কোনো অনুষ্ঠান এড়িয়ে চলা
৯. নতুন কারো সাথে পরিচিত হওয়া ও কথা চালিয়ে যেতে মসস্যা বোধ করা
১০. কারো সামনে বসে খেতে সমস্যা বোধ করা
১১. চোখের দিকে তাকিয়ে কথা না বলা

সামাজিক উদ্বেগ থেকে বের হয়ে আসার উপায়

দ্রুত কোনো পেশাদার মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া

১. নিয়মিত কোনো ডায়েরি লেখা যাতে প্রতিদিন কী মানসিক চাপের কারণ ছিল তার উল্লেখ থাকবে
২. যা উপভোগ্য তা করে কিছুটা সময় কাটানো
৩. যেকোনো ধরনের নেশা থেকে নিজেকে দূরে রাখা
৪. নেতিবাচক চিন্তাগুলোকে চিহ্নিত করা
৫. নেতিবাচক চিন্তাগুলোকে চ্যালেঞ্জ করা

মূলবার্তা : অন্যের চোখে নেতিবাচকভাবে মূল্যায়িত হবার ভয় থেকে সামাজিক উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। এর ফলে ব্যক্তির মধ্যে নানা ধরনের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যেয়ে, নিজের প্রতি ইতিবাচক চিন্তা করে ও অন্যান্য কৌশল অবলম্বন করে ব্যক্তি এই উদ্বেগ মোকাবেলা করতে পারে।

মানসিক চাপ

ব্যক্তির চাহিদা এবং ক্ষমতার মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হওয়ার ফলে ব্যক্তির নিজের মধ্যে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাকে মানসিক চাপ বলা হয়। অর্থাৎ আমরা যে কাজটি যেভাবে করতে চাই তা যখন পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে করতে পারি না তখন আমরা মানসিকভাবে চাপ অনুভব করে থাকি।

উদাহরণ- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারা, পরিবারের সদস্যদের কোনো প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারা, জোর করে কারো উপর মতামত চাপিয়ে দেওয়া, স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে না দেওয়া, বাজে মন্তব্যের শিকার হওয়া, কারো সামনে অপমানিত হওয়া, অবহেলিত হওয়া, পরীক্ষায় প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনে ব্যর্থ হওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো মানসিক চাপ সৃষ্টি করে।

মানসিক চাপের ফলে সৃষ্ট পরিবর্তনসমূহ : মানসিক চাপের ফলে শারীরিক, আবেগীয়, আচরণগত বিভিন্ন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে কিছু পরিবর্তন উল্লেখ করা হলো :

শারীরিক পরিবর্তনসমূহ	আবেগীয় পরিবর্তনসমূহ	আচরণগত পরিবর্তনসমূহ
বুক ধর-ফর করা	বিরক্ত বোধ	ঘুম না হওয়া
রক্ত চাপ বেড়ে যাওয়া	অত্যধিক রাগ	মাদক দ্রব্য গ্রহণ করা/মদ্যপান করা
ইনসমনিয়া (অনিদ্রা)	বিষণ্নতা	অমনোযোগীতা
মাথাব্যথা	উত্তেজনা	অলসতা বা অনীহা
বুকে ব্যথা	হতাশা	অকারণে হাঁটাহাঁটি করা
শ্বাস কষ্ট	কষ্ট	চিৎকার চেঁচামেচি করা
বমি বমি ভাব	আত্মবিশ্বাসের অভাব	কান্নাকাটি করা
ডায়রিয়া	অপরাধ-বোধ	ভুলে যাওয়া
পেট ব্যথা	অস্থিরতা	দোষারোপ করা
ঘাম হওয়া		খাবারে অরুচি বা অত্যধিক পরিমাণে খাবার গ্রহণ করা

মানসিক চাপের কারণসমূহ

মানসিক চাপের সম্ভাব্য কিছু কারণ নিম্নে দেয়া হলো :

- **পারিবারিক সুসম্পর্কের অভাব**

  পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আবেগীয় বন্ধন সবচেয়ে দৃঢ়। তাদের সাথে আমাদের সবচেয়ে বেশি মতের আদান প্রদান ঘটে। কখনও কখনও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মতের অমিল ঘটে, যার ফলে সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এতে মানসিক চাপের সৃষ্টি হয়।

- **কলহ**

  পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, জাতিগত, প্রথাগত ইত্যাদি ক্ষেত্রে সৃষ্ট কলহ আমাদের মধ্যে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে।

- **শিক্ষা**

  শিক্ষাক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রতিযোগীতামূলক মনোভাব, যোগ্যতা আনুযায়ী কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে না পারা, শিক্ষাবান্ধব পরিবেশের অভাব, আর্থিক অস্বচ্ছলতা, সঠিক দিকনির্দেশনার অভাব ইত্যাদি বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। অনেক সময় অভিভাবকরা সন্তানদেরকে তাদের সহপাঠীদের সাথে তুলনা করে ফেলেন, যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে।

- **কর্মক্ষেত্র**

  কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু অতিরিক্ত কাজের চাপ কর্মীদের মধ্যে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে যা তাদের কাজের গুণগত মান, উৎপাদনশীলতা, কাজের প্রতি আগ্রহ, আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি কমিয়ে দেয়। বিভিন্ন কারণে কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপ সৃষ্টি হতে পারে, যেমন :

  - অতিরিক্ত কাজের চাপ
  - নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত কাজ করা
  - উৎপীড়ন
  - পরিশ্রমের তুলনায় কম পারিশ্রমিক
  - সহকর্মীদের সাথে দ্বন্দ্ব
  - কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি ইত্যাদি

- **বেকারত্ব**

  যখন কোনো ব্যক্তি তার প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজের সুযোগ না পায় কিংবা কোনো ব্যক্তি যখন যোগ্যতার অভাবে কাজে অন্তর্ভুক্ত হতে না পারে তখন মানসিক চাপ অনুভব করে।

- **পারিপার্শ্বিক**

  পারিপার্শ্বিক পরিবেশ অনেক ক্ষেত্রে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে থাকে। যেমন : শব্দদূষণ, বায়ুদূষণ, পানিদূষণ, যানজট, তীব্র আলো, কক্ষে অপর্যাপ্ত বায়ু চলাচল, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ ইত্যাদি।

মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু উপায় নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- বাইরে হাঁটতে যাওয়া
- বিশ্বস্ত বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে সুন্দর সময় অতিবাহিত করা
- বিশ্বস্ত কারো সাথে মনের কথা শেয়ার করা
- পছন্দের বই পড়া, গান শোনা
- ডায়েরি লেখা
- ব্যায়াম করা
- আয়নায় নিজেকে দেখা
- হাত-মুখ ধৌত করা বা গোসল করা
- প্রার্থনা করা

- পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমানো
- প্রাকৃতিক পরিবেশে সময় অতিবাহিত করা
- নাক দিয়ে গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে মুখ দিয়ে প্রশ্বাস ছাড়া

মূলবার্তা : আমরা জীবনে চলার পথে নানা কারণে মানসিক চাপ অনুভব করে থাকি। নিজেদের মধ্যে নানা ধরনের পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা মানসিক চাপকে অনুভব করতে পারি। নিজের প্রতি যত্নশীল হওয়া, নিজের মানসিক চাপ গুলোকে নিজের মধ্যে না রেখে বিশ্বস্ত কারো কাছে শেয়ার করা ইত্যাদি পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করার মাধ্যমে আমরা মানসিক চাপ থেকে বের হয়ে আসতে পারি।

▶ রাগ

রাগ হচ্ছে এক ধরনের মৌলিক অনুভূতি যার উৎপত্তি ঘটে কষ্ট, হতাশা, বিরক্তি, আশাহত হওয়া ইত্যাদি থেকে। রাগ প্রকাশের মাত্রা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। সামান্য বিরক্তি প্রকাশমূলক শব্দ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যমে রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে। রাগ আমাদের স্বাভাবিক আবেগ। সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করলে এই আবেগ ক্ষতিকর নয়।

রাগের পূর্ব সংকেত

রাগের পূর্ব সংকেত হলো রাগ পূর্ববর্তী এমন কিছু সতর্কতামূলক ইঙ্গিত যা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে একজন মানুষ কখন রেগে যাচ্ছে। রাগের সংকেতসমূহ হতে পারে শারীরিক, আবেগীয়, চিন্তামূলক কিংবা আচরণমূলক। রাগ পূর্ব সংকেত সম্পর্কে আগে থেকেই সচেতন থাকলে রাগকে ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব হয় ফলে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

রাগ পূর্ব সংকেতসমূহ নিম্নে দেয়া হলো :

শারীরিক সংকেত

- হৃৎস্পন্দন বেড়ে যাওয়া
- বুকে চাপবোধ হওয়া
- মাথাব্যথা হওয়া
- বেশি বেশি চোখের পলক পড়া
- মাংসপেশীতে টান টান বোধ করা
- ঘাম হওয়া
- শ্বাস কষ্ট হওয়া
- শরীর কাঁপা ইত্যাদি

আবেগীয় সংকেত

- বিরক্তিবোধ
- হতাশা
- বিষণ্নতা

- হিংসা
- নিরাপত্তাহীনতা
- অগ্রহণযোগ্যতা
- মানসিক অবসাদবোধ
- ভয় পাওয়া
- অসম্মানবোধ
- অপরাধবোধ
- লজ্জাবোধ
- ভবিষ্যতের জন্য দুশ্চিন্তা করা ইত্যাদি

চিন্তামূলক সংকেত

- নিজের সাথে অতিরিক্ত নেতিবাচক কথা বলা
- আক্রমণাত্মক মনোভাব
- প্রতিশোধ পরায়ণতা ইত্যাদি

আমরা কোনো বিষয় নিয়ে যে ধরনের চিন্তা করি, আমাদের অনুভূতিও ঠিক সেই ধরনের হয়। যেমন : যখন আমরা কোনো ভাল বা ইতিবাচক চিন্তা করি তখন আমরা ভালো অনুভব করি, যেমন : আমরা আনন্দিত হই। আবার যখন নেতিবাচক চিন্তা করি তখন আমাদের অনুভূতিও নেতিবাচক হয়। যেমন : রাগ হয়, দুঃখ হয়, কষ্ট হয় ইত্যাদি। তাই আমাদের মনে রাখতে হবে, যে ঘটনাই ঘটুক না কেন আমরা ইতিবাচক চিন্তা করব, এতে ভালো অনুভূতি হবে, যার ফলে আমরা ভালো আচরণ করব।

ঘটনা → চিন্তা → অনুভূতি → আচরণ

আচরণমূলক সংকেত

- খুব দ্রুত কথা বলা
- উচ্চ স্বরে কথা বলা
- চিৎকার করা
- জোরে দরজায় আঘাত করা
- ভাংচুর করা
- মারামারি করা
- পরিস্থিতিকে এড়িয়ে যাওয়া
- নীরব বা চুপ থাকা

আমরা কী কারণে এবং কখন খুব সহজেই রেগে যাই

- Passive behavior pattern বা নিষ্ক্রিয় আচরণের ফলে
- সামাজিক সমর্থনের অভাব
- আবেগীয় বিশৃঙ্খলা- বিষণ্নতা, উদ্বেগ ইত্যাদি
- মানসিক আঘাতজনিত ঘটনা
- মানসিক চাপ
- আঘাত/অপমান করে কথা বললে
- হুমকির সম্মুখীন হলে
- নিজের লক্ষ্যে পৌঁছতে বাধাগ্রস্ত হয়ে হতাশ হওয়ার ফলে
- অসম্মানিত হওয়ার ফলে
- অধিকার খর্ব হলে ইত্যাদি

রাগের ফলে আমাদের কী কী ক্ষতি হয়

- শারীরিক ক্ষতি
- মানসিক ক্ষতি
- Career বা পেশাগত ক্ষতি
- পড়ালেখার ক্ষতি
- সম্পর্কের ক্ষতি
- বিষণ্নতায় ভোগা
- ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করা
- ঘুমের সমস্যা
- নেশায় জড়িয়ে পরা
- একই কাজ বারবার করার প্রবণতা
- Self-harm বা নিজের ক্ষতি করা
- রক্তচাপ বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি

▶ রাগ ব্যবস্থাপনার কৌশল

প্রতিক্রিয়া প্রকাশের আগে কিছুটা সময় নেয়া

কোনো ব্যক্তির উপর রেগে গেলে সাথে সাথে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ না করে, কিছুটা সময় নিয়ে নিজের আবেগকে আগে নিয়ন্ত্রণ করে তারপর ঐ ব্যক্তির সাথে কথা বলা। প্রয়োজনে ঐ মুহূর্তে ঐ ব্যক্তির সামনে থেকে সরে যাওয়া।

১-১০ পর্যন্ত ধীরে ধীরে গুণতে থাকা

ধীরে ধীরে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত গুণতে থাকলে মনোযোগ অন্যদিকে সরে যায়, ফলে রাগ কিছুটা কমে যায়। এভাবে কয়েকবার ১-১০ পর্যন্ত গুনতে থাকা।

Assertive ভাবে কথা বলা

- কোনো প্রকার ক্ষতিকারক আচরণ এবং অন্যকে অসম্মানজনক আচরণ প্রদর্শন না করে নিজের চিন্তা ও অনুভূতিকে নম্রভাবে প্রকাশ করা
- নম্রতার সাথে নিজের মতামত ব্যক্ত করা (কঠোর ভাষায় নয় অথবা অতিরিক্ত নরম ভাষায়ও নয়)
- সঠিকভাবে চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা (Eye contact করা)
- অন্যকে আঘাত বা ব্যঙ্গ করে কথা না বলা
- নিজের চিন্তা ও অনুভূতি সম্পর্কে সচেতন হওয়া
- সরাসরি কথা বলা
- সততার সাথে যুক্তিসঙ্গত কথা বলা

পর্যাপ্ত ঘুম

পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুম শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখে। ঘুম পরিমিত পরিমাণে হলে মন ও শরীর শান্ত থাকে যার ফলে শারীরিক, মানসিক, আবেগীয় (রাগ, দ্বন্দ্ব, ইত্যাদি) সমস্যা মোকাবেলা করা সহজ হয়।

ডায়েরি লেখা

কারো উপর রেগে গেলে রাগের কারণ, অনুভূতি ইত্যাদি বিষয়গুলো ডায়েরিতে লিখে ফেললে মনের কষ্ট কিছুটা হলেও কমে যায়। ডায়েরিতে মনের কথাগুলো নির্বিঘ্নে প্রকাশও করা যায় এবং কথাগুলোর গোপনীয়তাও বজায় থাকে।

শরীর চর্চা বা ব্যায়াম করা

নিয়মিত শরীরচর্চা, হাঁটা কিংবা দৌড়ানোর ফলে আমাদের শরীরে কিছু রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হয় যা আমাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। রাগের ফলে শরীরে কিছু অতিরিক্ত শক্তি উৎপন্ন হয় যা শরীরের জন্য উপকারী নয়। হাঁটা, দৌড়ানো কিংবা ব্যায়ামের ফলে এইসব অতিরিক্ত শক্তি শরীর থেকে বের হয়ে যায় ফলে উচ্চরক্তচাপ, রাগ ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণে থাকে।

নিঃশ্বাসের ব্যায়াম করা

নিয়মিত নিঃশ্বাসের ব্যায়াম করলে রক্তসঞ্চালন স্বাভাবিক থাকে। রাগের মুহূর্তে আমাদের শরীরের রক্ত সঞ্চালন দ্রুতগতিতে হতে থাকে যা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। রাগের মুহূর্তে নিঃশ্বাসের ব্যায়াম করলে আমাদের শরীর ও মনের স্বাভাবিকতা বজায় রাখা সহজ হয়।

পরিস্থিতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়া

রাগ সৃষ্টিকারী পরিস্থিতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়া এবং খোলা জায়গায় কিংবা আশেপাশের কোনো পছন্দের জায়গা থেকে কিছুক্ষণের জন্য হেঁটে আসা রাগ নিয়ন্ত্রণের একটি সুন্দর উপায়। আমরা যখনই বুঝতে পারব কোনো ব্যক্তি বা পরিস্থিতি আমাদেরকে রাগান্বিত করে তুলতে পারে, সেই ব্যক্তি বা পরিস্থিতিকে ঐ মূহূর্তে এড়িয়ে চললে রাগান্বিত হওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখা সম্ভব।

মনোচিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া

কিছু কিছু রাগ সম্পর্কিত সমস্যাগুলো নিজে নিজে ব্যবস্থাপনা সম্ভব হয় না। তাই এমন সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে রাগ নিয়ন্ত্রণের জন্য পেশাদার মনোচিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

মূলবার্তা : আমাদের জীবনে যখন কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে তখন আমাদের অনেক ধরনের নেতিবাচক চিন্তা এসে হাজির হয় যা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে নেতিবাচক অনুভূতি যেমন রাগ তৈরি করে। যেকোনো ধরনের আচরণের মাধ্যমে এই রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। শারীরিক , মানসিক ও আচরণগত কিছু সংকেতের মাধ্যমে রাগের উপস্থিতি বুঝতে পারা যায়। যথাযথভাবে রাগ ব্যবস্থাপনা করতে না পারলে তা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রাগকে যথাযথ মাধ্যমে প্রকাশ করা, নিজের অধিকারের কথা খুলে বলা ও অন্যান্য কৌশলগুলো অবলম্বন করার মাধ্যমে রাগ ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব।

মাদকাসক্তি

মাদক দ্রব্য

যে সব দ্রব্য সেবন করলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর ক্ষতিকর প্রভাব পরে এবং আসক্তি জন্মে সেগুলোই মাদক দ্রব্য। মাদক সরাসরিভাবে মস্তিষ্কে কাজ করে এবং এর ফলে মানুষের চিন্তা, অনুভূতি এবং আচরণের উপর নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটায়।

মাদকের ধরন

মাদক বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন : সিগারেট, বিড়ি, তামাক, চুরুট, মদ, গাঁজা, গুল, ঘুমের ঔষধ, কফ সিরাপ, হেরোইন, ইয়াবা ইত্যাদি।

মাদকাসক্তির কারণ

কৌতুহলের কারণে মানুষ অনেক সময় মাদকাসক্ত হতে পারে, হতাশাগ্রস্ত হওয়ার ফলে, মাদককে জীবন উপভোগ করার জিনিস মনে করা, দারিদ্রতা, ক্রমাগতভাবে কাজে ব্যর্থ হওয়া, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমস্যা, মানসিক চাপ, রাগ, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক সমস্যা, বন্ধুদের চাপে পড়ে মাদক নেয়া যেমন : বন্ধুরা অনেক সময় বলতে পারে যে "আমরা এখন বড় হয়েছি তাই আমরা মাদক নিতেই পারি" ইত্যাদি কথাবার্তার মাধ্যমে মাদক নিতে উৎসাহ দিতে পারে। বন্ধুরা এ ধরনের কথা বললেও মাদক গ্রহণ করা যাবে না।

মাদক এ আসক্তির লক্ষণ-

- দৈনন্দিন এবং সাধারণ কাজকর্ম থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়া
- সময়মতো কাজ সম্পন্ন করতে না পারা
- মানসিকতার দ্রুত পরিবর্তন হয়
- প্রচুর মিথ্যা কথা বলা
- কথায় কথায় অন্যদেরকে দোষারোপ করা
- দৈনন্দিন কাজে আগ্রহের অভাব
- কথায় অসংলগ্নতা
- অন্যদের সাথে যোগাযোগ করার দক্ষতার অভাব

- বিরক্তি
- কথা দিয়ে কথা না রাখা
- অপরাধবোধ
- আবেগের অস্থিতিশীলতা (হঠাৎ খুব রেগে যাওয়া)
- ঘুম ঘুম ভাব/ঝিম ধরা ভাব
- অতিরিক্ত কথা বলা অথবা একেবারেই কথা না বলা
- ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন
- আচরণের জন্য কারণ দর্শানো
- উদ্বিগ্নতা (Anxiety)
- বিষণ্নতা (Depression)
- একা থাকা ইত্যাদি

মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব

মাদকাসক্ত ব্যক্তি মনে করে তারা মাদককে খুব সহজেই ছেড়ে দিতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, মাদকদ্রব্য সেবনের ফলে, মাদকের প্রতি তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি হয় তাই তারা মাদকদ্রব্য ছাড়তে পারে না। ফলে তাদের মাদকদ্রব্য গ্রহণের পরিমাণ দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়। কোনো কারণে মাদকদ্রব্য সেবন করতে না পারলে, মাদকের অভাবে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ও মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। যেমন :

- মাদক গভীর অনুভূতিকে নষ্ট করে দেয়
- জ্ঞান ও স্মৃতি শক্তি কমে যায়
- শরীরে এবং মনে বিভিন্ন ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টি করে
- মাদক গ্রহণের ফলে খাদ্যনালী ও শ্বাসনালীর ক্যান্সার হতে পারে, ব্লাড প্রেশার হতে পারে, হার্টের অসুখ হতে পারে
- নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির ওজন দ্রুত কমে যায়
- মেজাজ খিটখিটে হয়
- ভুল দেখা, ভুল শোনা এবং নিজের প্রতি উচ্চ বা নিম্ন ধারণা তৈরি হতে পারে
- কথায় কথায় মানুষকে সন্দেহ করতে পারে
- আচরণ আক্রমণাত্মক হয়ে উঠে (যেমন : মারামারি করে, অনেক সময় মাদকাসক্ত মানুষ তার পরিবারের সদস্যদেরকে খুনও করে ফেলতে পারে)
- ক্ষুধা নষ্ট হয়ে যায়
- ঘুমের সমস্যা হয়
- প্রতিনিয়ত একটা নির্দিষ্ট সময়ে জ্বর আসতে পারে
- মাদকাসক্ত মানুষ পড়ালেখার ক্ষমতা এবং কাজ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে পারে
- আত্মসম্মানবোধ নষ্ট হয়ে যায়
- মারাত্মক অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পরে (যেমন : চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুন ইত্যাদি)
- বাবা-মা যদি মাদকাসক্ত হন তাহলে বিকলাঙ্গ বা স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন সন্তান জন্ম হতে পারে

পরিবার ও সমাজে মাদকের পরিণতি

- মাদকদ্রব্য সেবনকারী পরিবারের সদস্য ও অন্যান্যদের সাথে উগ্র আচরণ করে
- মাদক কেনার ফলে আর্থিক ক্ষতি হয়
- মাদকদ্রব্য সেবনকারী নেশার টাকার জন্য পরিবারে চাপ সৃষ্টি করে
- রাস্তা ঘাটে ছিনতাই করতে পারে, টাকাপয়সা, মালপত্র লুট করতে পারে
- মারাত্মক অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে (যেমন : চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুন ইত্যাদি)

মাদক প্রতিরোধের উপায়

- যেসব বন্ধুরা মাদক গ্রহণে উৎসাহ যোগায় অথবা সহযোগিতা করে তাদের থেকে দূরে থাকা
- কোনো কারণে মন খারাপ থাকলে Relaxation Exercise করা (Reference: মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনার Relaxation Exercise)
- যেসব ছাত্র-ছাত্রী একবার অথবা একাধিকবার কিছুটা মাদক নিয়েছে যেমন : কোনো ছাত্র-ছাত্রী হয়তোবা কখনও সিগারেট খেয়েছে এবং এখন তার আবার খেতে ইচ্ছে করছে সেই মুহূর্তে সে পানি, চকলেট বা অন্য কিছু খেতে পারে
- মাদক কে “না” বলা
- নিজের সাথে প্রতিজ্ঞা করা

    ১) আমরা নিজেকে ভালোবাসব

    ২) আমরা পরিবার, সমাজ ও দেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হিসেবে অবদান রাখার জন্য আজ থেকে আমরা সবাই মাদককে “না” বলব

    ৩) “আমরা কখনই মাদক গ্রহণ করব না, আমরা কখনই মাদক গ্রহণ করব না, আমরা কখনই মাদক গ্রহণ করব না ” (সবাই মিলে একসাথে তিনবার বলবে)

মাদকাসক্তি সম্পর্কিত ভিডিও : https://www.youtube.com/watch?v=YIci8ASnoY4

মূলবার্তা : কৈশোরকালে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি আচরণ হলো-মাদক গ্রহণ করা। অনেক সময় বন্ধুদলের চাপ, কৌতুহল ও অন্যান্য কারণে তারা নানা ধরনের মাদকের প্রতি আসক্ত হতে পারে। মাদক গ্রহণের ফলে বিরক্তি, অসংলগ্ন কথাবার্তা, সাধারণ কাজ কর্ম থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। মাদক গ্রহণের ফলে ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন ও সামাজিক জীবন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মাদকের লক্ষণগুলো পরিলক্ষিত হলে বাবা-মা ও শিক্ষকরা কিশোর-কিশোরীদেরকে সহায়তা দানের মাধ্যমে এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করতে পারেন। নিজের সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া ও দৃঢ়ভাবে “না” বলতে শেখা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা।

পরীক্ষা-ভীতি

পরীক্ষা সম্বন্ধে একটা সাধারণ ভয় বা চিন্তা সবার মনে বিরাজ করে যা পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন, তবে অতিরিক্ত পরিমাণ ভয় ছাত্র-ছাত্রীর জন্য পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণে এবং কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের পথে সমস্যা তৈরি করতে পারে। এই ভয় পরীক্ষার্থীর জন্য এমন ভীতিকর পরিবেশের সৃষ্টি করে যে পরীক্ষার কথা শুনলেই সে নানা রকম শারীরিক, মানসিক অসুস্থতায় ভুগতে থাকে যেমন : বুক ধড়ফড় করা, প্রচুর ঘাম হওয়া, হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসা, বমি বমি লাগা ইত্যাদি।

পরীক্ষা-ভীতির শারীরিক ও মানসিক উপসর্গসমূহ

- বমি বমি ভাব হওয়া, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বমি হয়ে যাওয়া
- খাওয়া দাওয়া করতে না পারা
- বুক ধড়ফড় করা
- মাথাব্যথা করা, মাথা ভারভার লাগা, মাথা ঘুরানো
- চোখে ঝাপসা দেখা
- ঘুম না আসা
- বাস্তবের সাথে সামঞ্জস্যহীনতা
- হঠাৎ করে হাত-পা প্রচণ্ড ঠান্ডা হয়ে আসা
- ঘনঘন পাতলা পায়খানা হওয়া
- মূর্ছা যাওয়া
- মনোযোগ দিতে না পারা
- অল্পতে একাগ্রতা হারিয়ে ফেলা
- স্মৃতিশক্তি সাময়িকভাবে ব্যাহত হওয়া

পরীক্ষা-ভীতির কারণ এবং কাদের হয়?

(ক) বংশগত কারণ

(খ) মস্তিষ্কের জৈব-রাসায়নিক পরিবর্তনজনিত কারণ

(গ) শৈশব পর্যায় থেকে শিশুর মানসিক বিকাশে ত্রুটি, যেমন বিভিন্ন ধরনের অসুখী অভিজ্ঞতা, অভিভাবকের ভালোবাসা, সহযোগিতা ও সহমর্মীতার অভাব, সাহস, শৃঙ্খলাবোধের অভাব ইত্যাদি।

(ঘ) ব্যক্তিত্বের ত্রুটি ছেলেটি বা মেয়েটির শৈশব থেকেই থাকতে পারে, যেমন বদ্ধমূল (Obsessional) বা মৃগীরোগ (Hysteria) ব্যক্তিত্বের অধিকারী হলেও এ সমস্ত সমস্যা হতে পারে।

(ঙ) আর্থ-সামাজিক কারণ : পিতামাতার বারবার ঝগড়া, পরিবারের সদস্যদের মাঝে ভুল বোঝাবুঝি, আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি ইত্যাদি।

পরীক্ষা-ভীতি দূর করার উপায় বা সমাধান

১. পরীক্ষা সংক্রান্ত সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা (Accurate information)

পরীক্ষার নির্দিষ্ট তারিখ, সময়সূচি, রুটিন, সিলেবাস ঠিকমতো জোগাড় করে সে অনুসারে প্রস্তুতি নেয়া।

২. পর্যাপ্ত এবং কার্যকরী অনুশীলনসহ পড়াশুনা করা (Effective studying)

প্রতিদিন নিয়মিত পড়া, যেখানে পরীক্ষার সময়সূচি, প্রতিটি পরীক্ষার আগে কতদিন ছুটি, কোন বিষয়টি কঠিন তুলনামূলক বেশিদিন পড়তে হবে, কোনটি সহজ তুলনা অল্পদিন পড়তে হবে সবকিছু উল্লেখ করে পড়ালেখার একটি দৃশ্যমান তালিকা তৈরি করা, বুঝে পড়া মুখস্থ করা, উদাহরণের সাথে পড়ার সংযোগ করে পড়া।

৩. পরীক্ষা উপযোগী পড়াশুনা করা (Exam-taking preparation)

ভালোভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য পরীক্ষার সিলেবাস ও পরীক্ষার পূর্বের ক্লাস গুলোর উপর জোর দিতে হবে, পূর্ববর্তী বছরের প্রশ্নপত্রগুলো ব্যাখ্যা করে প্রশ্নের ধরন বুঝতে হবে, প্রশ্নগুলোর সমাধান করতে হবে।

৪. বন্ধুদের সাথে দলবদ্ধভাবে পড়ালেখা করা (group study with friends)

একে অপরকে প্রশ্ন করা, উত্তর দেয়া, সবার সাথে আলোচনা করে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নির্ধারণ করা, একে অপরকে পড়া বুঝিয়ে দেয়ার মাধ্যমে পড়ালেখা করা।

৫. স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করা (Healthy lifestyle)

পরিমিত ঘুম-৭/৮ ঘণ্টা, পুষ্টিকর খাবার খাওয়া, বেশি বেশি পানি পান করা, ব্যায়াম, খেলাধুলা ও বিনোদন-'টিভি দেখা/গল্প করা'এর সাথে জীবনযাপন করা।

৬. মনোভাব উন্নতিকরণ (Attitude upgrading)

প্রথমেই নির্ধারণ করতে হবে দুশ্চিন্তার কারণ কী, এটা কি প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির অভাবে, না ফলাফল খারাপ হলে অন্যরা কী বলবে এ কারণে। যদি অন্যরা কী বলবে এটা দুশ্চিন্তার প্রধান কারণ হয় তাহলে ভাবতে হবে জীবনে পরীক্ষা থাকবেই। পড়াশুনার সাথে পরীক্ষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি পরীক্ষা কখনই পুরো জীবনের সফলতা বা ব্যর্থতা বর্ণনা করে না। পরীক্ষা বিষয়টিকে জীবনের একটি অংশ হিসেবে নিয়ে সাধারণভাবে গ্রহণ করার মানসিকতা অর্জনের চেষ্টা করতে হবে।

৭. দুশ্চিন্তা ও অমূলক ভীতি দূর করার কিছু পদ্ধতি (Anxiety or Phobia reduction techniques)

প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করার পর ও যদি দুশ্চিন্তা হয় সেক্ষেত্রে বিভিন্ন relaxation কৌশল যেমন deep breathing, imaginary ব্যবহার করা যেতে পারে।

মূলবার্তা : পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে কিশোর-কিশোরীদের মনে নানা ধরনের ভয়-ভীতি লক্ষ্য করা যায়। এ সময় অনেকের মধ্যে বমি বমি ভাব, মাথাব্যথা, শরীর ব্যথা, হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। আগে থেকে সঠিকভাবে প্রস্তুতি নেয়া, সুষ্ঠ সময় ব্যবস্থাপনা ও ভীতি দূরীকরণের কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে পরীক্ষা ভীতিকে মোকাবিলা করা সম্ভব।

জীবন দক্ষতা

জীবন দক্ষতা হলো এমন কতগুলো দক্ষতা ও ইতিবাচক আচরণ যা ব্যক্তিকে দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা ও চ্যালেঞ্জগুলো ফলপ্রসুভাবে মোকাবেলা করতে সহায়তা করে, অন্য কথায় এটা এক ধরনের মনোবৈজ্ঞানিক যোগ্যতা।

এগুলো হলো এমন কতগুলো দক্ষতা যা ব্যক্তিকে অন্যের সাথে মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে নিজের আবেগগুলো শনাক্তকরণ ও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে জীবনের সব কিছু মোকাবেলা করতে সহায়তা করে।

আমাদের জীবনে জীবন দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা

- আত্মবিশ্বাস ও আত্ম-সম্মানবোধ বৃদ্ধি পায়
- অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়
- নিজস্ব মতামত প্রকাশের দক্ষতা বাড়ে
- কমিউনিটি ও সমাজে সক্রিয়া ভূমিকা রাখতে পারে
- অন্যের ও নিজের কল্যাণের ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়
- জীবনের নানা ধরনের পরিবর্তন ও চ্যালেঞ্জগুলো সফলভাবে মোকাবেলা করার দক্ষতা বাড়ে
- বন্ধুত্বপূর্ণ ও সুষ্ঠু সম্পর্ক গড়ে তুলতে ও বজায় রাখতে সহায়তা করে

কিছু গুরুত্বপূর্ণ জীবন দক্ষতা হলো

- সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা (Decision making Skill) : যেমন : বিদ্যালয়ের বিষয় নির্বাচন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া, নিজের পছন্দমতো পোষাক বাছাই করা
- সমস্যা সমাধানের দক্ষতা (Problem Solving Skill) : যেমন : বন্ধুদের সাথে দ্বন্দ্ব নিরসন করতে পারা
- সৃজনশীল চিন্তন (Creative Thinking) : যেমন : নিজের মতো করে কিছু লেখা যেমন গল্প, কবিতা। কোনো নকশা তৈরি করা, ক্রাফট তৈরি করা ইত্যাদি
- যৌক্তিক চিন্তন (Logical Thinking) : যেমন : কোনো কাজ করার আগে ভালো-মন্দ, ফলাফল বিবেচনা করা
- ফলপ্রসু যোগাযোগ (Effective Communication) : যেমন : নিজের প্রয়োজনকে বুঝিয়ে বলা ও পাশাপাশি অন্যের অনুভূতিকে বুঝতে পারা
- ব্যক্তিগত সম্পর্ক (Interpersonal Relationship) : যেমন : সম্পর্ক তৈরি করা ও তাকে রক্ষা করা
- আত্ম-সচেতনতা (Self-awareness) : নিজের দক্ষতা ও সীমাবদ্ধতাগুলো সম্পর্কে সচেতনতা
- সহমর্মীতা (Empathy) : কাউকে বিচার না করে তার অনুভূতিকে বুঝতে চেষ্টা করা
- দৃঢ়তার সাথে “না” বলতে পারা (Assertiveness) : যেমন : অপ্রত্যাশিত কোনো কিছুকে দৃঢ়ভাবে ‘না’ বলা। উদাহরণস্বরূপ-মাদককে ’না’ বলতে পারা, পরীক্ষার আগের দিন বন্ধু খেলতে ডাকলে তাকে ‘না’ করতে পারা
- মানসিক চাপ, ট্রমা ও অন্যান্য আবেগের সাথে খাপ খাওয়ানো (Coping with stress; Trauma & loss) : যেমন : পরীক্ষাকে ভীতি হিসেবে না নিয়ে ভালো প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারা, নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো

মূলবার্তা : জীবন দক্ষতা হলো গুরুত্বপূর্ণ মনোবৈজ্ঞানিক যোগ্যতা যার দ্বারা আমরা আমাদের আবেগ শনাক্ত করে থাকি। এর মাধ্যমে আমরা নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারি। জীবন দক্ষতা আমাদেরকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে, নিজস্ব মতামত প্রকাশের দক্ষতা বাড়ায়। কতিপয় জীবন দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের জীবনকে অপেক্ষাকৃত সহজভাবে পরিচালিত করতে পারি।

প্যারেন্টিং

প্যারেন্টিং হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা একটি শিশুকে তার শারীরিক, আবেগীয়, সামাজিক এবং বুদ্ধিগত বিকাশের মাধ্যমে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে পরিণত হতে সহায়তা করে। মূলত প্যারেন্টিং হলো-জৈবিক সম্পর্কের সূত্র ধরে শিশুকে লালন-পালন করা।

কিশোর বয়সের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে প্যারেন্টিংয়ের ভূমিকা

কিশোর বয়সকে বিবেচনায় নিলে শুধু যে তাদের শারীরিক বৃদ্ধি, শারীরিক গঠন, আবেগীয় ও বুদ্ধিগত পরিবর্তন হয় তা না বরং এই সময়ে পরিবারের মধ্যে নানা ধরনের দ্বন্দ্ব ও উত্থান-পতন দেখা যায়।

কিশোরদের সম্পর্কে বড়দের অনেক নেতিবাচক ধারণা থাকলেও তারা কর্মোদ্যোগী, চিন্তাশীল এবং আদর্শবাদী। যদিও এই সময় বাবা-মা ও সন্তানের মধ্যে অনেক ধরনের দ্বন্দ্বের তৈরি হয়, যথাযথ প্যারেন্টিং তাদেরকে সুষ্ঠভাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করে। প্যারেন্টিং কীভাবে সহায়তা করবে নিচে তা নিয়ে আলোচনা করা হলো।

সন্তানের কিশোর বয়সকে বিবেচনায় নেয়া

যেহেতু প্রতিটি মানুষ আলাদা তাই কিশোর বয়সের শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত এবং আচরণগত পরিবর্তনগুলো একই সময়ে হয় না। কারো ক্ষেত্রে আগে হয়, কারো ক্ষেত্রে ধীর গতিতে হয়। সন্তানরা এই বয়সে নিজের বাহ্যিক রূপ এবং ভিন্নভাবে নিজেকে পরিচিত করাতে চায়, নিজেকে সমবয়সিদের থেকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করার প্রতি মনযোগী হয়। সাধারণত এই বিষয়গুলোই বাবা-মা ও সন্তানের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। বাবা-মায়েরা যদি এই পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে সজাগ এবং সচেতন থাকেন তাহলে সন্তানদেরকে এই পরিবর্তনগুলোর সাথে খাপ খাওয়াতে সহায়তা করতে পারবেন।

মতামত প্রদানের সুযোগ দেয়া

যেহেতু কিশোর-কিশোরীরা বড় হতে শুরু করে তাই তাদের যৌক্তিক এবং সৃজনশীল চিন্তা করতে শুরু করে। তাই তারা পূর্বে যে সিদ্ধান্তগুলোকে মেনে নিত সেগুলোতে নিজের মতামতকে জোরালোভাবে প্রকাশ করতে শুরু করে। এই হঠাৎ পরিবর্তনগুলো বাবা-মায়ের মনে শংকার তৈরি করে। এসময় বাবা-মায়েরা তাদের নিজেদের ও সন্তানের ব্যাপারে আরো গভীরভাবে ভাবা দরকার।

নিজেকে নিজে কিছু প্রশ্ন করা যেতে পারে-

- আমি কি আমার সন্তানকে মাত্রাতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ করতে চাই?
- আমি কি আমার সন্তানের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছি?
- আমি কি আমার সন্তানকে আমার থেকে ভিন্ন মতামত এবং চিন্তা প্রকাশের সুযোগ দিচ্ছি?

খোলামেলাভাবে কথা বলার পরিবেশ তৈরি করা

এই বয়সে কিশোর-কিশোরীদের মনে তাদের নিজেদের সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। প্যারেন্টিংয়ের মাধ্যমে খোলামেলা পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং তাদের মনে জমে থাকা প্রশ্নগুলো করার সুযোগ দেয়া। প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা থাকলে তা শেয়ার করা আর না জানা থাকলে যথাযথ ব্যক্তির কাছ থেকে জানার ব্যবস্থা করা। যেমন : বিশ্বাসযোগ্য কোনো ব্যক্তি বা বন্ধু অথবা বিশেষজ্ঞ।

সন্তানকে তার মতো করে বোঝা

নিজেকে সন্তানের জায়গায় রেখে তার চিন্তা ও অনুভূতিগুলোকে বুঝতে চেষ্টা করা এবং তার পরিস্থিতিটা তার মতো বোঝা। এই বয়সে যে এই ধরনের অনুভূতি হতে পারে তা বিবেচনায় নেয়া এবং তাদের প্রতি সহমর্মীতার সাথে আচরণ করা।

সম্মানের প্রত্যাশা করা

প্যারেন্টিংয়ের ধরন এমন হবে যে যা সন্তানদের সহায়তা করবে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে, প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-নীতি মেনে চলতে। তবে বাবা-মায়েরা অবশ্যই নমনীয় হবে, কঠোর হবে না, মতামত প্রকাশে সুযোগ দিবে। বাবা-মায়েদের আচরণের মাধ্যমে এটা প্রকাশ করতে হবে যে তারা তাদের কাছ থেকে সম্মান এবং নিয়ম-নীতি পালনের প্রত্যাশী।

সন্তানের প্রতি প্রত্যাশিত আচরণ নিজেও প্রদর্শন করা

আমরা সন্তানের প্রতি যে ধরনের আচরণ আশা করি একজন বাবা-মা হিসেবেও আমাদের ঠিক সে ধরনের আচরণ প্রদর্শন করতে হবে। বাবা-মা তাদের কাছে একজন আদর্শ ব্যক্তিত্ব হবেন। যেমন : আমরা তার প্রতি সম্মান প্রত্যাশী হলে আমরা তার প্রতি ও অন্যান্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করব।

শিশুদের নেতিবাচক আচরণের কারণ

- শিশুদের ইচ্ছেমতো কাজ করতে না দিলে
- কাজের স্বীকৃতি না দিলে
- খেলার সুযোগ না পেলে
- নেতিবাচক পরিবেশের মধ্যে বেড়ে উঠলে
- সহযোগিতা না পেলে বা কম পেলে
- অসুস্থ থাকলে
- প্রাক-শৈশবকালীন কোনো বিশেষ অসুস্থতা থাকলে
- সঠিক চিকিৎসা বা পরিচর্যা না পেলে
- শিশুর পছন্দের গুরুত্ব না দিলে
- ঝগড়া, মারামারি, হিংসা ও বিদ্বেষপূর্ণ পরিবেশে মানুষ হলে
- শিশুকে শাস্তি, অতিরিক্ত চাপ বা মানসিক অশান্তি দিলে
- শিশু পারিবারিক মূল্যবোধ বা সামাজিক শিক্ষা না পেলে

বয়ঃসন্ধী-কালীন সময়ে সন্তানদের প্রতি বাবা-মার দোষারোপ বা হুমকীমূলক আচরণ

বয়ঃসন্ধী-কালীন সময় একটি শিশুর জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ও স্পর্শকাতর। এই সময় তাদের আচরণে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। তাদের শারীরিক পরিবর্তনের কারণে মানসিক অস্থিরতা দেখা যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা নিজেরা আসলে কী তা নিয়েই সন্দিহান থাকেন। সুতরাং এই সময় সন্তানদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়া, তাদের সাথে সুস্থ সম্পর্ক বজায় রাখা বাবা-মার নৈতিক দায়িত্ব, অন্যথায় তাদের আচরণের উপর নেতিবাচক প্রভাব পরে। অর্থাৎ যদি সন্তানদেরকে কোনো কারণে দোষারোপ বা হুমকি দেয়া হয় তাহলে এর প্রভাব সন্তানদের আচরণে উপর দেখা যায় যা ভবিষ্যতে তাদের ব্যক্তিত্বের উপর হুমকিস্বরূপ। যেমন :

সন্তানের আচরণের উপর দোষারোপ বা হুমকির প্রভাব

- আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দেয়
- নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে
- অল্পতেই ধৈর্যহীন হয়ে পরে
- সমাজ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়
- নিজের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়
- নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে
- সকল ক্ষেত্রে অবিশ্বাস দেখা দেয়
- অসৎ সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে
- ধূমপায়ী বা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে
- অল্পতেই অস্থির হয়ে পড়ে
- নিজেকে নিষ্কর্মা মনে করে
- অল্পতেই হতাশ হয়ে পড়ে
- মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্পর্কে ধারণা থাকে না

সুতরাং, সন্তানদের ব্যক্তিত্বের সঠিক গঠনের ব্যাপারে বাবা মাকে বিশেষ যত্নশীল হতে হবে।

বয়ঃসন্ধি-কালীন সময়ে সন্তানদের প্রতি বাবা-মার করণীয় আচরণ

- সন্তানদের কথা মনোযোগ সহকারে শোনা
- তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা
- তারা যে আমাদের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝানো, এক্ষেত্রে তাদের বন্ধুদের খবর, স্কুলের খবর জানতে চাওয়া ও মনোযোগ দিয়ে শোনার মাধ্যমে তাদের গুরুত্ব বোঝাতে পারি
- এই বয়সে তাদের অনেক বিষয়ে কৌতূহল দেখা যায় যা অনেক সময় বয়স অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক নাও হতে পারে, সেক্ষেত্রে রাগ না করে সেসব বিষয় সম্পর্কে সংযতভাবে জানানো
- তাদের বন্ধু- বান্ধবদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, এতে করে সন্তানদের সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়
- অনেক সময় বাবা মায়ের মতের সাথে সন্তানদের মতের অমিল হতে পারে, সেক্ষেত্রে সন্তানদের দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে বিষয়বস্তুগুলোকে অনুধাবন করতে হবে
- দিনে কমপক্ষে একবার পরিবারের সকলে মিলে একসাথে সময় কাটানো, এতে করে সন্তান পরিবারের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে।

উপরে উল্লেখিত আচরণগুলো বয়ঃসন্ধি-কালীন সময়ে সন্তানদের সুষ্ঠভাবে বেড়ে উঠার জন্য বিশেষভাবে সহায়তা করবে।

প্যারেন্টিং সম্পর্কিত ভিডিও : **https://www.youtube.com/watch?v=aycpcWeiL0I**

মূলবার্তা : একমাত্র সঠিক প্যারেন্টিংই পারে সন্তানের শারীরিক, আবেগীয়, বুদ্ধিগত এবং সামাজিক বিকাশে সহায়তা করে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে। কিশোর-কিশোরীদেরকে তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ দেয়া, সন্তানের কিশোর বয়সকে বিবেচনায় নিয়ে তার সাথে আচরণ করলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তার জন্য খাপ খাওয়াতে সহজ হবে। সন্তানের ব্যক্তিত্বের সঠিক বিকাশের জন্য বাবা মাকে যত্নশীল হতে হবে, তা না হলে সন্তান একাকিতে ভোগে, আত্মবিশ্বাস কমে যায়, এমনকি অসৎ কাজেও জড়িয়ে যেতে পারে।

স্বদেশ-প্রেম

স্বদেশ-প্রেম হলো 'নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করা'। স্বদেশ-প্রেমের চেতনা কিশোর-কিশোরীদের ভবিষ্যতে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। স্বদেশ প্রেম হলো দেশের প্রতি সেবা। স্বদেশ-প্রেমের সাথে ৪টি মূল বিষয় জড়িত :

১. নিজের দেশের প্রতি বিশেষ ভালোবাসা

২. নিজেকে ওই দেশের বলে পরিচয় দেয়া

৩. নিজের দেশের উন্নয়নের প্রতি খেয়াল রাখা

৪. দেশের ভালোর জন্য যেকোনো ধরনের ত্যাগ স্বীকার করা

যেকোনো ধরনের দেশ প্রেমের দায়িত্বের মধ্যে দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

কিছু উপায়ে বাবা-মায়েরা কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে স্বদেশ প্রেমের চেতনা জাগিয়ে তুলতে পারে। নিম্নে উপায়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো :

- বাংলাদেশের অতীত ঐতিহ্য যেমন : প্রত্নতত্ত্ব, হস্তশিল্প ইত্যাদি সম্পর্কে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা এবং ঐতিহাসিক স্থানগুলোতে তাদেরকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া
- তাদের সাথে ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা যুদ্ধ, স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহসী বীরদের অবদান এ ধরনের নানা ঐতিহাসিক ঘটনা তাদের সামনে তুলে ধরা
- শিশু ও কিশোর-কিশোরীদেরকে ঐতিহাসিক ঘটনা ও বীরদের বীরত্বের ছবি সম্বলীত বই কিনে দেয়া এবং তাদের একসাথে পড়া
- আমাদের দেশের জাতীয় প্রতীকগুলোকে পরিচিত করানো এবং সেগুলোর প্রতি সম্মান প্রদ্রর্শন করতে শেখানো। যেমন : জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনস্বরূপ উঠে দাঁড়ানো
- প্রত্যেক বাবা-মার উচিত তার সন্তানদেরকে দেশপ্রেম সম্পর্কিত নানা কর্মকাণ্ড যেমন : স্বাধীনতা দিবস, শহীদ দিবস, বিজয় দিবস উদযাপন ইত্যাদি কর্মকাণ্ডগুলোতে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা
- নিজের সন্তানের মধ্যে স্বদেশ-প্রেম জাগ্রত করতে হলে নিজেকেও স্বদেশ-প্রেমী হতে হবে যাতে করে তারা স্বদেশ প্রেমী হওয়ার অনুপ্রেরণা পায়

মূলবার্তা : স্বদেশ-প্রেমের চেতনা লালনের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীরা দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে বেড়ে ওঠে। বাবা-মায়েরা সন্তানের মনে স্বদেশ-প্রেমের চেতনা রোপনের জন্য জাতীয় ঐতিহ্যের সাথে পরিচয় করানো, ইতিহাস জানানো বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

[বিঃ দ্রঃ স্বদেশ-প্রেম সম্পর্কিত কেস পৃষ্ঠা নং ৭০ তে সংযুক্ত করা হয়েছে।]

▶ শিশু অধিকার

শিশু

শিশু অধিকার আইন ২০১৩ অনুযায়ী- বিদ্যমান অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অনুর্ধ্ব ১৮ (আঠারো) বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল ব্যক্তি শিশু হিসাবে গণ্য হইবে।

শিশু অধিকার

শিশু অধিকার বলতে একজন শিশুর স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, পরিবারের সাথে জীবন-যাপন, খেলা এবং বিনোদন, সম্মানের সাথে বেঁচে থাকা, যেকোনো ধরনের নির্যাতন এবং ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকারকে বোঝানো হয়।

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯ অনুযায়ী-

বিশ্বের প্রতিটি মানুষের মর্যাদা এবং জাতিসংঘ নীতিমালা ও ঘোষণা অনুযায়ী সমঅধিকারের স্বীকৃতিই হচ্ছে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও বিশ্ব শান্তির ভিত্তি।

উল্লেখিত বিষয়টি বিবেচনায় রেখে জাতিসংঘের প্রতিটি সদস্য দেশ উক্ত সনদে বর্ণিত মৌলিক মানবাধিকার এবং মানুষের মর্যাদা ও মূল্যবোধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তাদের বিশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করেছে। আরোও স্বাধীনভাবে সমাজকে এগিয়ে নিতে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে দৃঢ় অঙ্গিকার ব্যাক্ত করেছে।

এই বিষয়টি সামনে রেখে জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নীতিমালায় এ কথা স্বীকৃত হয়েছে যে গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম রাজনৈতিক অথবা ভিন্নমত, জাতীয়তা কিংবা সামাজিক পরিচয়, শ্রেণি, জন্মসূত্র কিংবা অন্য কোনো মর্যাদা নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ কোনো প্রকার বৈষম্য ছাড়াই এই ঘোষণায় বর্ণিত সব ধরনের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করবে।

শিশু আইন ২০১৩ এর নবম অধ্যায়- 'শিশু সংক্রান্ত বিশেষ অপরাধসমূহের দন্ড' অনুযায়ী শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতার দণ্ড হিসেবে বর্ণিত আছে- "কোনো ব্যক্তি যদি তাহার হেফাজতে, দায়িত্ব বা পরিচর্যায় থাকা কোনো শিশুকে আঘাত, উৎপীড়ন, অবহেলা, বর্জন, অরক্ষিত অবস্থায় পরিত্যাগ ব্যক্তিগত পরিচর্যার কাজে ব্যবহার বা অশালীনভাব প্রদর্শন করা এবং এইরূপভাবে আঘাত, উৎপীড়ন, অবহেলা, বর্জন, পরিত্যাগ ব্যক্তিগত পরিচর্যা বা প্রদর্শনের ফলে উক্ত শিশুর অহেতুক দুর্ভোগ সৃষ্টি হয় বা স্বাস্থ্যের এইরূপ ক্ষতি হয়, যাহাতে সংশ্লিষ্ট শিশুর দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়, শরীরের কোনো অঙ্গ বা ইন্দ্রিয়ের ক্ষতি হয় বা কোনো মানসিক বিকৃতি ঘটে, তাহা হইলে তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।"

প্রতিটি দেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমুহে শিশুদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে।

উল্লেখিত এই সকল বিষয় গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে ঐক্যমত ঘোষণা করছে:

১. শিশুর বয়স (এই সনদে ১৮ বছরের নিচে সব মানব সন্তানকে শিশু বলা হবে)

২. শিশু অধিকারের প্রতিকারের প্রতি শ্রদ্ধা

৩. শিশুর স্বার্থরক্ষা

৪. সনদের বাস্তবায়ন

৫. শিশুর প্রতি দায়িত্ব
৬. শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার
৭. শিশুর জন্ম নিবন্ধীকরণ
৮. শিশুর আইনসম্মত পরিচিতি
৯. পিতামাতার সাথে বসবাসের অধিকার
১০. পারিবারিক সংহতি
১১. শিশু পাচার প্রতিরোধ
১২. শিশুর মত প্রকাশের অধিকার
১৩. শিশুর ভাবপ্রকাশের অধিকার
১৪. শিশুর চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা
১৫. শিশুর সংঘবদ্ধ ও সমাবেশের অধিকার
১৬. শিশুর মর্যাদা ও সুনামের অধিকার
১৭. শিশুর শারীরিক এবং মানসিক উন্নয়ন
১৮. শিশুর লালন পালন
১৯. শিশুর প্রতি আচরণ
২০. পরিবার বঞ্চিত শিশুর যত্ন
২১. দত্তক প্রদান
২২. শরণার্থী শিশুর অধিকার
২৩. প্রতিবন্ধী শিশুর অধিকার
২৪. শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টি
২৫. শিশুর চিকিৎসা পরিচর্যা
২৬. শিশুর সামাজিক নিরাপত্তা
২৭. শিশুর উন্নয়ন
২৮. শিশুর শিক্ষা লাভের অধিকার
২৯. শিশুর শিক্ষা
৩০. সংখ্যালঘুদের অধিকার
৩১. শিশুর অবসর ও বিনোদন
৩২. শিশুর বিকাশ

শিশু আইন ২০১৩ পঞ্চম অধ্যায়- 'শিশু-আদালত এবং উহার কার্যপ্রণালী' তে শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতার দণ্ড হিসেবে বর্ণীত আছে-

(১) অপরাধের শিকার শিশুর বিরুদ্ধে আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত কোনো শিশু দোষী সাব্যস্ত হইলে, উক্ত শিশু বা তাহার মাতা-পিতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্য, প্রবেশন কর্মকর্তা, আইনজীবী বা পাবলিক প্রসিকিউটরের অনুরোধক্রমে অথবা শিশু-আদালত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া শিশুকে পূর্ববিস্থায় ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য উপযুক্ত

ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য দোষী সাব্যস্তকৃত শিশুর পিতা-মাতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য কোনো আদেশ প্রদান করিলে শিশু-আদালত উক্ত আদেশে তদ্‌কর্তৃক নির্ধারীত সময়ের মধ্যে এককালীন বা কিস্তিতে ক্ষতিপূরণের অর্থ আদালতের মাধ্যমে পরিশোধের জন্য এবং শিশুর কল্যাণে উহার ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দিক্-নির্দেশনা প্রদান করিবে।

মূলবার্তা : আঠার বছরের নিচে সবাই শিশু বলে গণ্য হয়। সকল শিশুরই স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, খেলা, বিনোদন, সম্মানের সাথে বেঁচে থাকা, নির্যাতন ও ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এই অধিকার সুনিশ্চিত কল্পে 'শিশু অধিকার আইন ২০১৩' প্রবর্তন করা হয়েছে। যেখানে উল্লেখ আছে শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা, অবহেলা, পরিত্যাগ, অশালীনভাব প্রদর্শন করলে ব্যক্তি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।"

▶ সাইবার বুলিং/সাইবার হয়রানী

বুলিং

বুলিং বলতে কাউকে মানসিক বা শারীরিকভাবে হেনস্তা করা বোঝায়। কাউকে অপমান, অপদস্ত করা, কারো সামনে কাউকে হেয় করা, এগুলোই বুলিং। অনেক সময় কাউকে অপদস্ত করাকে অনেকে মজা হিসেবে দেখে, কিন্তু যে ব্যক্তির সাথে মজা করা হয়, তিনি বুলিং-এর শিকার হন।

উদাহরণ স্বরূপ- কারো গায়ের রং, শরীরের গঠন, উচ্চতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে মজা করা, কাউকে আপত্তিকর ভাষায় ডাকা ইত্যাদি।

সাইবার বুলিং/সাইবার হয়রানী

সাইবার বুলিং/সাইবার হয়রানী বলতে বোঝায় কাউকে ইলেকট্রনিক মাধ্যমের সহায়তায় বুলিং করা। এটাকে আজকাল অনলাইন বুলিংও বলা হয়। কিশোর বয়সের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে আজকাল এই সমস্যাটা খুব বাড়ছে। এটা হতে পারে মিথ্যা প্রচারণামূলক, হুমকি, যৌন হয়রানী করা, যার পেছনের উদ্দেশ্য থাকে কারো ক্ষতি করা।

- ২০১৬ সালে বিশ্বখ্যাত টেলিনর গ্রুপের করা এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বাংলাদেশের স্কুলে যাওয়া শিশুদের প্রায় ৪৯% নানা ধরনের বুলিংয়ের শিকার হয়। সবচেয়ে আশংকার ব্যাপার হলো, এর মধ্যে ২৯% শিশু সাইবার বুলিংয়ের কারণে বিষণ্নতায় ভোগে। সূত্র :

  (https://www.dhakatribune.com/feature/tech/2017/02/07/survey-29-asian-children-depressed-due-cyberbullying)

সাইবার বুলিংয়ের মাধ্যম

- ফেসবুক
- হোয়াটঅ্যাপ
- ইমো
- ভাইবার
- ম্যাসেন্‌জার ইত্যাদি

সাইবার বুলিংয়ের ফলে মানসিক প্রভাব

১. হতাশা
২. উদ্বেগ
৩. ঘুম ও খাদ্যাভাসে পরিবর্তন
৪. নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক সমস্যার কথা বলা
৫. অন্যদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা
৬. আত্মহত্যার ঝুঁকি

সাইবার বুলিং প্রতিরোধের উপায়

- অপরিচিত কারও সাথে অনলাইনে বন্ধুত্ব বা অন্য কোনো সম্পর্কে না জড়ানো
- অপরিচিত কারও সাথে অনলাইনে কোনো ধরনের ব্যক্তিগত মেসেজ দেয়া থেকে বিরত থাকা
- বিরক্তিকর ব্যক্তিকে ব্লক করে দেওয়া
- সাইবার বুলিং নিয়ে বিশ্বস্ত কাউকে জানানো
- অন্যান্য শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানানো এবং সাইবার বুলিং প্রতিরোধে নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করা
- সাইবার বুলিং প্রতিরোধে সচেতনতা বাড়ানো

সাইবার বুলিং সম্পর্কিত ভিডিও : **https://www.youtube.com/watch?v=WDDQ-Z7_N3k**

মূলবার্তা : ইচ্ছা করে/অনিচ্ছাকৃতভাবে কাউকে শারীরিক ও মানসিকভাবে হেনস্তা করাই হলো বুলিং। বুলিং যেকোনো মাধ্যমে হতে পারে যেমন : ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি। বুলিংয়ের শিকার হলে একজন ব্যক্তি মানসিকভাবে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিছু প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ব্যক্তি বুলিং ও সাইবার বুলিংয়ের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বের হয়ে আসতে পারে।

▶ বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহ

সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বয়সসীমার পূর্বে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে বাল্যবিবাহ বলে।
যেহেতু Child Marriage Restraint Act, 1929 (Act No. XIX of 1929) রহিতপূর্বক সময়োপযোগী করে নূতনভাবে প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ছিল, সেহেতু এতদ্দ্বারা ২০১৭ সনের ৬নং আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইন বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ নামে অবহিত।

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই আইনে -

১. **"অপ্রাপ্ত বয়স্ক"** অর্থ বিবাহের ক্ষেত্রে ২১ বছর পূর্ণ করেন নাই এমন কোনো পুরুষ এবং ১৮ বছর পূর্ণ করেন নাই এমন কোনো নারী;

২. **"অভিভাবক"** অর্থ Guardians and Wards Act, 1890 (Act no. Viii of 1890) এর অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত বা ঘোষিত অভিভাবক এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির ভরণ-পোষণ বহনকারী ব্যক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত হইবে

৩. **“প্রাপ্ত বয়স্ক”** অর্থ বিবাহের ক্ষেত্রে ২১ বছর পূর্ণ করেছেন এমন কোনো পুরষ এবং ১৮ বছর পূর্ণ করেছেন এমন কোনো নারী;

৪. **“বাল্যবিবাহ”** অর্থ এইরূপ বিবাহ যার কোনো এক পক্ষ বা উভয় পক্ষ অপ্রাপ্ত বয়স্ক; এবং

৫. **“বিধি”** অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি।

বাল্যবিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের শাস্তি

১. আদালত, স্ব-উদ্যোগে বা কোনো ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে বা অন্য কোনো মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, যদি এই মর্মে নিশ্চিত হন যে, কোনো বাল্যবিবাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে অথবা বাল্যবিবাহ অত্যাসন্ন তাহা হইলে আদালত উক্ত বিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবে।

২. আদালত স্বেচ্ছায় বা অভিযোগকারী ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে উপ-ধারা (১) এর অধিন প্রদত্ত প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

৩. কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করিলে তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং আর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ১ (এক) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

বাল্যবিবাহ করার শাস্তি

১) প্রাপ্তবয়স্ক কোনো নারী বা পুরুষ বাল্যবিবাহ করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

২) অপ্রাপ্তবয়স্ক কোনো নারী বা পুরুষ বাল্যবিবাহ করিলে তিনি অনধিক ১ (এক) মাসের আটকাদেশ বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় ধরনের শাস্তি যোগ্য হইবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৮ এর অধীন কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা দণ্ড প্রদান করা হইলে উক্তরূপ অপ্রাপ্ত বয়স্ক নারী বা পুরুষকে শাস্তি প্রদান করা যাবে না।

বাল্যবিবাহে পিতা-মাতা সহ অন্যান্য ব্যক্তির শাস্তি

অনধিক ০২ বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ০৩ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

বাল্যবিবাহ সম্পাদন বা পরিচালনা করার শাস্তি

অনধিক ০২ বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ০৩ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

বাল্যবিবাহ নিবন্ধনের জন্য বিবাহ নিবন্ধকের শাস্তি, লাইসেন্স বাতিল

অনধিক ০২ বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে এবং অর্থদণ্ডে অনাদায়ে অনধিক ০৩ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

ক্ষতিপূরণ প্রদান : (১) এই আইনের অধীন আরোপিত অর্থদণ্ড হইতে প্রাপ্ত অর্থ ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা : ‘ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ’ অর্থ বাল্যবিবাহের যে পক্ষ অপ্রাপ্ত বয়স্ক।

অপরাধ আমলে নেয়ার সময়সীমা

বাল্যবিবাহ সম অপরাধ সংঘটিত হবার ০২ বছরের মধ্যে অভিযোগ দায়ের করা না হলে আদালত উক্ত অপরাধ আমলে নিবে না।

বাল্যবিবাহের কারণ

- যৌতুক প্রথা
- দারিদ্র
- ভয়
- সামাজিক চাপ
- নিরাপত্তাহীনতা
- ধর্ম ও আইন
- নির্যাতন, জোরপূর্বক দেশান্তর ও দাসত্ব

বাল্যবিবাহের প্রভাব

শারীরিক প্রভাব

- বাল্যবিবাহ মেয়েদের স্বাস্থ্য ও জীবনের জন্য হুমকি স্বরূপ
- কিছু বুঝে ওঠার আগেই শারীরিক সম্পর্ক ঘটে যা কষ্ট ও ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়
- শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে যায়
- অনেক সময় স্বামী কর্তৃক ধর্ষিত হয়

মানসিক প্রভাব

- মানসিক ক্লান্তি ও অনীহা তৈরি হয়
- ক্রোধ/রাগ জন্মায়
- দুঃখ/হতাশা তৈরি হয়
- উদ্বিগ্নতা তৈরি হয়
- প্রাণচাঞ্চল্য হারিয়ে যায় এবং লেখাপড়ায় বাধা পড়ে
- অল্প বয়সে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতা মেনে নিতে পারে না

সামাজিক প্রভাব

- সমবয়সি অন্যান্যদের থেকে নিজেকে আলাদা মনে করে
- শ্বশুর বাড়ির মানুষ কর্তৃক নির্যাতিত হয়
- বাল্যবিবাহ মেয়েদের শিক্ষা জীবনের ইতি ঘটায়। এতে নিরক্ষরতার ও দারিদ্রের হার বেড়েই চলছে
- অল্প বয়সে কম শিক্ষিত বিবাহিত মেয়েদের পারিবারিক সহিংসতার হার বেশি

- বাল্যবিবাহ মানবাধিকারের জন্য হুমকি স্বরূপ
- উচ্চ হারে বাল্যবিবাহ দেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলে কারণ, বাল্যবিবাহ নারী শিক্ষা আর শ্রম বাজারে নারীর অংশগ্রহণে বাধা দেয়
- বাচ্চাকে ঠিকভাবে যত্ন নিতে পারে না, তাই বাচ্চার স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়

বাল্যবিবাহ রোধের উপায়

১. বাবা-মা বিয়ে দিতে চাইলে কেন এখন বিয়ে করা ঠিক না তা বাবা-মা'কে বোঝানো

২. কাউকে জোর করে বিয়ে দিতে চাইলে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাকে জানানো এবং বন্ধু-বান্ধবীরা মিলে প্রতিরোধের চেষ্টা করা

৩. বাল্যবিবাহ আইন সম্পর্কে পরিবার সদস্যদের এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অবগত করা

৪. বিভিন্ন সমাজ সচেতনতামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা যেমন : বাল্যবিবাহ প্রতিরোধমূলক বিভিন্ন ধরনের কর্মশালা, সচেতনতামূলক নাটকের আয়োজন করা

৫. অভিভাবক সভা, শিক্ষক-ছাত্রদের মধ্যে সচেতনতামূলক আলোচনাসভার ব্যবস্থা করা

৬. প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের সাহায্য নেওয়া

মূলবার্তা : অপ্রাপ্ত বয়সে (ছেলেদের ২১ বছর, মেয়েদের ১৮ বছর) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে বাল্যবিবাহ বলে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশে দারিদ্র, সামাজিক চাপ, ধর্ম ও নিরাপত্তাহীনতার মতো বিষয়গুলোর কারণে বাবা-মায়েরা অনেক সময় সন্তানের নির্দিষ্ট বয়সের আগে বিয়ে দিয়ে দেন। বাল্যবিবাহের কারণে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক অনেক ধরনের ক্ষতি হয়ে থাকে। এমন কি বাল্যবিবাহের কারণে অপরিণত বয়সে মা হতে গিয়ে মৃত্যু ঝুঁকিতেও পড়তে পারেন। বাল্যবিবাহ রোধে আইন সম্পর্কে পরিবারের সদস্যদের জানানো, শিক্ষক-ছাত্রদের মধ্যে সচেতনতামূলক আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত ভিডিও : **https://www.youtube.com/watch?v=2JK12lb8J-A**

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু ও কিশোর-কিশোরী

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু ও কিশোর-কিশোরী বলতে সাধারণত এমন শিশুদের বোঝানো হয় যাদের বিশেষ মনোযোগ ও সুনির্দিষ্ট কিছু প্রয়োজন থাকে যা অন্য শিশুদের থাকে না। এ চাহিদাগুলো শারীরিক, মানসিক, আচরণগত বা শেখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধীতা থাকে। অটিজম, সেরিব্রাল পলসি, ডাউন সিন্ড্রোম, অন্ধত্ব, এডিএইচডি ইত্যাদি বিভিন্ন রকম বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু ও কিশোর-কিশোরী হয়ে থাকে।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু ও কিশোর-কিশোরীদেরকে সহায়তার উপায়

- ভুল করলে ক্ষমার চোখে দেখা
- সাধারণ জ্ঞানের ব্যবহার করা
- নমনীয় হওয়া
- কোনো কিছুতে বার বার পরিবর্তন না করা
- সহমর্মী হওয়া
- ইতিবাচক ব্যবহার করা

- প্রশংসা করা
- দৃষ্টিগত, শ্রবণগত ও স্পর্শগত সংবেদন ব্যবহার করে বুঝতে সহায়তা করা
- পরিকল্পনা মাফিক আগানো

অটিস্টিক শিশু

অটিজম একটি বিকাশজনিত ব্যাধি। এটা সামাজিক যোগাযোগে ব্যাঘাত ঘটায় এবং আচরণগত পার্থক্য ও পরিলক্ষিত হয়।

উপসর্গ

১. সামাজিক-আবেগীয় ভাবের আদান-প্রদান করতে অপারগ হয়। দৈনন্দিন কথপোকথনে অংশগ্রহণ করতে পারে না; তাই কাউকে কিছু শেয়ার করার আগ্রহ তৈরি হয় না, আবেগ প্রকাশ করে না, কোনো কিছুতে কোনো প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ করে না।

২. অ-মৌখিক কোনো শারীরিক ভাষা প্রদর্শনে অক্ষম। যেমন : চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না, কোনো ধরনের কোনো মুখভঙ্গি প্রদর্শন করে না।

৩. সম্পর্ক তৈরি করা, রক্ষা করা ও বুঝতে পারার দক্ষতা থাকে না। যেমন : বিভিন্ন সামাজিক পরিবর্তনে প্রয়োজনে অনুযায়ী আচরণ করতে না পারা। সমবয়সিদের প্রতি কোনো আগ্রহ বোধ করে না, তাই তাদের কোনো বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে না।

৪. বারবার একই ধরনের শারীরিক অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করে, অথবা বারবার একই কথা বলে।

৫. দৈনন্দিন রুটিনের কোনো পরিবর্তন আসলে মেনে নিতে পারে না।

অটিস্টিক শিশুদের এই উপসর্গগুলো তাদের খুব ছোটবেলা থেকেই চোখে পড়ে এবং প্রতিদিনকার জীবনে ব্যাঘাত ঘটায়। কারো কারো ক্ষেত্রে সামাজিক শিক্ষার কারণে বড় হওয়ার পরে অটিস্টিক আচরণ পরিলক্ষিত হয়। যা "সামাজিক অটিজম" নামে পরিচিত।

অনেক মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা এবং মনোসমীক্ষণবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, অটিজম আক্রান্ত শিশুর পিতামাতাদেরও সাইকোথেরাপি প্রয়োজন। সাইকোথেরাপির মাধ্যমে মাতাপিতারা শিশুদের কীভাবে কার্যকরভাবে আবেগীয় বিকাশ হয় তা উপলব্ধি করবেন।

মূলবার্তা : অন্য শিশুদের তুলনায় যাদের বিশেষ মনোযোগ রয়েছে তারাই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ক্ষেত্রে নমনীয় আচরণ প্রদর্শন করতে হবে ও তাদের সাথে ইতিবাচক ব্যবহার করতে হবে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের মধ্যে অটিজম অন্যতম। এটি একটি বিকাশজনিত ব্যাধি। সামাজিকভাবে ভাবের আদান-প্রদান করতে না পারা এই শিশুরা চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না, নিয়মিত রুটিনের কোনো হেরফের দেখলে অস্বস্তি বোধ করে। এই ধরনের বাবা-মায়েরা সাইকোথেরাপী গ্রহণ করলে তারা এই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের আবেগীয় বিকাশ আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবেন।

[বিঃ দ্রঃ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও কিশোর-কিশোরী সম্পর্কিত কেস পৃষ্ঠা নং ৬৯ ও ৭০ তে সংযুক্ত করা হয়েছে।]

জেন্ডার/জেন্ডার বৈষম্য

জেন্ডার/লিঙ্গ

নারী এবং পুরুষের মধ্যকার যে সামাজিক পার্থক্য রয়েছে, যা জন্মের পর থেকে শুরু হয়, যা মানুষের বা সমাজের সৃষ্টি, যা একেক যায়গায় একেক রকম এবং ইচ্ছা করলে অবশ্যই পরিবর্তন করা যায় তাকেই বলে নারী এবং পুরুষের সামাজিক পরিচিতি বা জেন্ডার।

সেক্স

নারী এবং পুরুষের মধ্যে এক ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা শারীরিক বা দৈহিক। এটা স্রষ্টার সৃষ্টি, যা কোনোভাবেই পরিবর্তন করা যায় না এবং পৃথিবীর সব জায়গায় একইরকম। এই দৈহিক বা শারীরিক বৈশিষ্ট্যকেই সেক্স বলে।

তৃতীয় লিঙ্গ

১০ থেকে ১৯ বছর এমন একটা সময়কাল যখন ছেলে ও মেয়ের মধ্যে পার্থক্যগুলো স্পষ্ট হতে থাকে। এ সময় থেকেই আশা করা হয় যে ছেলেরা ছেলেদের মতো ও মেয়েরা মেয়েদের মতো আচরণ করবে। স্বাভাবিকভাবে যারা যথেষ্ট মেয়েলী বা পুরুষালী নয় তারা এসময় থেকে নিজেকে ভিন্ন এবং অনুপযুক্ত ভাবতে শুরু করে। যদিও স্বাভাবিকভাবে সকলেই কেবল বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াকে সঠিক বলে ধরে নেয়, তবে এ সময় অনেকেই সমলিঙ্গ বা উভয় লিঙ্গের প্রতিও আকৃষ্ট হতে পারে, যা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক একটি আচরণ।

আমরা মনে করি আমাদের সমাজে দুইটি মাত্র জেন্ডার-নারী আর পুরুষ। কিন্তু সমাজে অনেকেই আছে যারা এই দুই গন্ডির বাইরে গিয়ে নিজেকে দেখে। এদেরকে আমরা ট্রান্সজেন্ডার বলি।

একই লিঙ্গের সদস্যদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকে সমকামীতা বলা হয়। সমকামীরা একই লিঙ্গের প্রতি যৌন আকর্ষণ বোধ করে এবং যৌন আচরণ করে।

পুরুষদের মধ্যে সমকামী প্রবণতা অধিক হারে পরিলক্ষিত হলেও, মেয়েদের মধ্যেও এরূপ প্রবণতা বিরল নয়। ফ্রয়েডের মতে, কামশক্তির সংবন্ধনই (Fixation of Libido) সমকামী প্রবণতার জন্য দায়ী। সমকামীদের মধ্যে যারা বিপরীত লিঙ্গের ভূমিকা গ্রহণ করে, তারা অনেক সময় প্রকাশ্যভাবে বিপরীত লিঙ্গের সাজসজ্জা ও হাবভাব অনুকরণ ও প্রদর্শন করে।

জেন্ডার বৈষম্য

জেন্ডার বৈষম্য বলতে পরিবার ও সমাজ কর্তৃক তৈরিকৃত বিভিন্ন পার্থক্যগুলোকে বোঝানো হয়ে থাকে যা নারী-পুরুষের মাঝে নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তিতে বৈষম্যের সৃষ্টি করে।

বিভিন্ন পরিবার ও সমাজের এই বৈষম্য কিন্তু তাদের আইনসিদ্ধ বা নীতিগত কিংবা নৈতিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই বৈষম্য সমানাধিকার অর্জনের অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

আমাদের সমাজে নারী ও পুরুষ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাসমূহ

নারী	পুরুষ	প্রকৃত অর্থে
নারীরা দুর্বল হবে।	পুরুষ শক্তিশালী হবে।	নারী পুরুষের চেয়ে শক্তিশালী হতে পারে।
নারীরা কম আত্মবিশ্বাসী হবে।	পুরুষরা আত্মবিশ্বাসী হবে।	আত্মবিশ্বাস লালন পালন ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে।
নারীরা হবে সিদ্ধান্ত পালনকারী।	পুরুষরা হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী।	পুরুষের মতো নারীও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী একজন নারী।
নারীরা লাজুক হবে।	পুরুষরা কঠিন হবে।	লজ্জা ও বিনয় সকল মানুষের জন্য প্রয়োজন।
নারীরা ঘরের কাজ করবে।	পুরুষরা বাইরের কাজ করবে।	সবাই মিলে কাজ করতে হবে।
নারীরা ভীতু হবে।	পুরুষরা সাহসী হবে।	উভয়ের জন্য সাহস গুরুত্বপূর্ণ।
নারীরা পরিবারের বোঝা।	পুরুষরা পরিবারের সম্পদ।	শিক্ষিত ও কর্মক্ষম নারী এবং পুরুষ সকলেই পরিবারের সম্পদ।

সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলো পৃথিবীতে নারীদেরকে পুরুষদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাধ্য করেছে। প্রাকৃতিক কিছু কারণেও নারীরা পুরুষদের চেয়ে আলাদা অবস্থানে থাকে। যেমন : নারীদেরকে মাসিকের সময়টিতে সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্নভাবে দেখা হয়। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, নারীরা কখনোই পুরুষের তুলনায় কম পারদর্শী ছিল না এবং তখন যে নারী পুরুষের আধিপত্য মেনে নিয়ে দাসত্ব করত এমনও নয়। মেয়েরা কেবল সন্তান জন্মদান এবং নিপীড়িত স্ত্রী হয়েই ছিল তা নয় বরং তারা সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করে অবদান রেখে আসছেন। (Chapman 1982: 62) যেমন : ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দারের সাহসী পদক্ষেপ, বাংলাদেশে নারীদের অধিকার আদায়ের জন্য বেগম রোকেয়ার সাহসী লেখনী ও কাজ আজও স্মরণীয়। মেয়েরা বর্তমানে পুরুষের পাশাপাশি সেনাবাহিনীতে, বিমান চালনায় সবর্ত্র সাফল্যের সাথে কাজ করছে।

জেন্ডার ও সেক্সের মধ্যে পার্থক্য

জেন্ডার	সেক্স
জেন্ডার সামাজিক, মানুষের সৃষ্টি	সেক্স প্রাকৃতিক, সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি
জেন্ডার পরিবর্তনীয়।	সেক্স সাধারণত অপরিবর্তনীয়।
জেন্ডার সমাজে ছেলে ও মেয়ের আচার-আচরণ, ভূমিকা, দায়-দায়িত্ব।	শারীরিক বিষয়। যা দ্বারা ছেলে ও মেয়ের শারীরিক পার্থক্য প্রকাশ পায়।
স্থান ও সময়ভেদে ভিন্ন হয়।	পৃথিবীর সব জায়গায় একই রকম।

জেন্ডার বৈষম্যের কারণ

- গতানুগতিক পিতৃতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- পর্দা ব্যবস্থার অপব্যাখ্যা ও ভ্রান্ত ধারণা
- অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর সীমিত অংশগ্রহণ
- মেয়েদের শিক্ষার প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি
- নারীর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব

জেন্ডার বৈষম্যের প্রভাব

- সমাজের প্রতি ক্ষোভ তৈরি
- অপুষ্টি ও রক্তশুন্যতায় ভোগা
- যৌতুকের শিকার হওয়া
- নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া
- হীনমন্যতা
- বিষণ্নতা
- রাগ
- আকস্মিক মেজাজের পরিবর্তন
- উদ্বিগ্নতা
- অসহায়বোধ

জেন্ডার বৈষম্য দূর করার জন্য করণীয়

- ছেলে-মেয়েকে সমান চোখে দেখা
- সকলকে লিঙ্গ বৈষম্য সম্পর্কে সচেতন করা
- মেয়েদের লেখাপড়া, প্রতিষ্ঠা ও স্বাবলম্বী হওয়ার ব্যপারে পরিবার, সমাজ ও সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে হবে
- কিশোর-কিশোরী একে অপরকে সমান চোখে দেখা দরকার এবং সমান মর্যাদা ও সম্মান দেওয়া দরকার
- কেউ বৈষম্যমূলক আচরণ করলে তাকে এর প্রভাব ও ফলাফল সম্পর্কে জানাতে হবে এবং এ ধরনের আচরণ না করার জন্য অনুরোধ করতে হবে
- সামাজিক অন্যায় আচরণ যেমন : মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া, যৌতুক প্রথা মেনে নেওয়া, মেয়েদের লেখাপড়া করতে না দেওয়া ইত্যাদির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রয়োজন।

মূলবার্তা : নারী ও পুরুষের সামাজিক পরিচয়কে 'জেন্ডার' বলা হয়। নারী এবং পুরুষের মধ্যে শারীরিক বৈশিষ্ট্যকে 'সেক্স' বলে। সমাজে সাধারনত পুরুষ ও নারী এই দুই ধরনের জেন্ডার আছে। এই দুই গন্ডির বাইরে যারা আছে তারাই 'ট্রান্সজেন্ডার' নামে পরিচিত। পুরুষ নারীর প্রতি এবং নারী পুরুষের প্রতি যৌন আকর্ষণ বোধ করবে এরকমটাই স্বাভাবিক বলে ধরা হয় তবে যারা সম লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হয় তাদেরকে সমকামী বলা হয়। সমকামীদের মধ্যে যারা বিপরীত লিঙ্গের ভূমিকা পালন করে তারা অনেক সময় লোকসম্মুখে বিপরীত লিঙ্গের সাজ-পোষাক ধারণ করে থাকে।

সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত নারী-পুরুষের পার্থক্যগুলো যখন কোনো সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বৈষম্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তখন তা 'লিঙ্গ বৈষম্যে'র সৃষ্টি করে। সমাজে নারীকে দুর্বল, লাজুক, ভীতু আর পুরুষকে শক্তিশালী, আত্মবিশ্বাসী, সাহসী হিসেবে দেখা হলেও ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নারী কখনোই পুরুষের তুলনায় কম পারদর্শী ছিল না বরং তারা সমাজের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করে এসেছে। বৈষম্য দূরীকরণের জন্য ছেলে-মেয়েকে সমান চোখে দেখা এবং সচেতনতা তৈরি করা জরুরি।

যৌন হয়রানি

যৌন হয়রানি হলো অযৌক্তিক এবং অস্বস্তিকর যৌন আচরণ বা যৌন মনোযোগ যা আপত্তিকর, অপমানজনক বা ভীতিজনক।

যেমন : যৌন বিষয় সম্পর্কিত যেকোনো মন্তব্য করা, অশ্লীল ফোন-কল করা, শারীরিক সংস্পর্শ ইত্যাদি।

- নিম্নোক্ত পরিস্থিতিতে যৌন হয়রানি হতে পারে-
  - স্কুল
  - কলেজ
  - কাজের ক্ষেত্র
  - পরিবহণ
  - অভিনয়ের ক্ষেত্র
  - সংগীত
  - ব্যাবসা ইত্যাদি
- যৌন হয়রানিকারী একজন সহকর্মী, অভিভাবক বা আইনি অভিভাবক, আত্মীয়, শিক্ষক, ছাত্র, অথবা বন্ধুও হতে পারেন। তিনি যে বিপরীত লিঙ্গেরই হতে হবে এমন না, অপরাধী এবং VICTIM বা অপরাধের শিকার ব্যক্তি যেকোনো লিঙ্গের হতে পারেন।

যৌন হয়রানির হার

একটি গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা দিয়েছে

- ৯৪% মহিলা পাবলিক পরিবহণে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন, তারা আরও বলেন ভিকটিমদের মধ্যে ৮১% নীরবে প্রতিক্রিয়া করে এবং ৭৯% শুধু সহ্য করে নেয় (GISMA Business school, BRAC, 2018)
- সমগ্র দেশে মোট ৮১৮ জন মহিলা ধর্ষণ হয়েছে তার মধ্যে ৪৭ জনকে ধর্ষণ করার পর হত্যা করা হয়েছে এবং ১১ জন আত্মহত্যা করেছেন (Ain O Salish Kendra (ASK), 2017)

যৌন হয়রানির ধরন

নিম্নে যৌন হয়রানির কতগুলো ধরন দেওয়া হলো-

১. **শারীরিক যৌন হয়রানি :** শারীরিক যৌন হয়রানি বলতে অপ্রত্যাশিত এবং আপত্তিকর শারীরিক স্পর্শকে বোঝানো হয়। যেমন : অনুমতি ছাড়া তাকে স্পর্শ করা, হঠাৎ জড়িয়ে ধরা এবং অন্যান্য যেকোনো শারীরিক সংস্পর্শ করা ইত্যাদি।

২. **মৌখিক যৌন হয়রানি :** ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে কোনো অপমান, অসম্মানজনক কথা বলা বা যৌন মন্তব্য করা যেমন : যৌন বিষয় সম্পর্কিত যেকোনো মন্তব্য করা, যৌনতা বিষয় সম্পর্কে অযাচিত প্রশ্ন করা, যৌন মন্তব্যের মাধ্যমে অপমান করা, যৌন উদ্দীপক কৌতুক বলা এবং যৌন মিলনের প্রস্তাব দেওয়া।

৩. **আবেগীয়/মানসিক যৌন হয়রানি :** যে সকল যৌন হয়রানি কোনো ব্যক্তিকে আবেগীয়/মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে তাকে আবেগীয়/মানসিক যৌন হয়রানি বলে। যেমন : অন্যের কাছে গুজব ছড়ানো, ভিডিও এবং অডিও রের্কড ধারণ করে তা নিয়ে ব্ল্যাকমেইল করা, বাজে মন্তব্য করা ইত্যাদি করা যার ফলে ব্যক্তির মধ্যে রাগ, কষ্ট, হতাশা, বিরক্তি ইত্যাদি দেখা দেয়।

৪. **সাইবার যৌন হয়রানি :** সাইবার যৌন হয়রানি হলো মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যক্তিকে অকারণে হয়রানি করা যেমন : যৌন বার্তা এবং এ সম্পর্কিত গান পাঠানো, ভিডিও দেখানো, অশ্লীল ফোন কল করা, অন্যের ফেসবুকে আপত্তিকর ছবি, ভিডিও পোস্ট করে হয়রানি করা ইত্যাদি।

এছাড়াও

- কুদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা
- অযৌক্তিক এবং আপত্তিকর উপাদান প্রদর্শন করা (পোস্টার, কার্টুন ইত্যাদি)
- নানা ধরনের আপত্তিকর যৌন অঙ্গভঙ্গি প্রকাশ করা
- অশ্লীলভাবে নিজেকে প্রকাশ করা বা যৌন নির্যাতন করা

যৌন হয়রানির প্রভাব

যৌন হয়রানির ফলে একজন ব্যক্তির মধ্যে নানা ধরনের নেতিবাচক প্রভাব দেখা দিতে পারে-

- মানসিক চাপ, উদ্বেগ বা বিষণ্নতাবোধ হওয়া
- সবকিছু থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া
- সম্পর্কের অবনতি
- বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি পায়
- আত্মসম্মানবোধ এবং আত্মবিশ্বাস কমে যাওয়া
- মনমরা থাকা, মাথাব্যথা এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা হওয়া
- লেখাপড়ায় মনোযোগ ও আগ্রহ কমে যাওয়া এবং পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল করা
- আত্মহত্যা বা নিজের বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি করা ইত্যাদি

যৌন হয়রানির প্রতিরোধ এবং প্রতিকার ব্যবস্থা

- প্রথমে ভিকটিমের কথা মনোযোগ দিয়ে এবং নিরপেক্ষভাবে শুনতে হবে, তাকে সহমর্মীতা দেওয়া এবং তার কথা গোপন রাখা
- দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া
- ব্যক্তি যখন যৌন হয়রানির শিকার হবেন, তখন শিক্ষক তার অনুমতি নিয়ে তার পরিবারের সাথে আলোচনা করতে পারেন, প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাহায্য নিতে পারেন
- শিক্ষক তাকে বলতে পারেন তার পরিবার এবং অন্যান্যদের মধ্য থেকে বিশ্বাসযোগ্য কারও সাথে তার ঘটনাটি শেয়ার করা
- শিক্ষক তাকে ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত ডায়েরি লিখতে বলতে পারেন
- যেকোনো প্রমাণ সংরক্ষণ করা যেমন : মেসেজ, সামাজিক মাধ্যমের মন্তব্য এগুলো সংরক্ষণ করে রাখা যা পরবর্তীতে প্রমাণস্বরূপ কাজে লাগতে পারে
- অন্যদের থেকে তথ্য ও উপদেশ নিতে বলা
- প্রচলিত প্রথানুযায়ী অভিযোগ করা
- নিজেকে দোষ না দেয়া

- আত্মবিশ্বাসের সাথে “না” বলতে শেখানো
- অপরাধীর সাথে কথা বলা এবং তাকে বোঝানো
- কেউ যৌন হয়রানির শিকার হলে শিক্ষার্থীদেরকে একে অপরকে সাহায্য করতে বলা
- প্রয়োজনে কাউন্সেলরের কাছে রেফার করা

সর্তকতা

- শিক্ষার্থীদেরকে যৌন হয়রানি সম্পর্কে সচেতন থাকতে বলা
- যারা এ ধরনের কাজ করতে পারে তাদের চিহ্নিত করা
- একা একা কোথাও না যেয়ে দলে যাওয়ার চেষ্টা করতে বলা
- আগ বাড়িয়ে কেউ আপন ভাব দেখালে বা সাহায্য করতে চাইলে তা ভেবে-চিন্তে গ্রহণ করা ইত্যাদি।

মূলবার্তা : অযৌক্তিক ও অস্বস্তিকর যৌন আচরণ বা যৌন মনোযোগ ব্যক্তির জন্য আপত্তিকর, অপমানজনক ও ভয়ের। নানা ধরনের যৌন হয়রানির মধ্যে শারীরিক যৌন হয়রানি, মৌখিক যৌন হয়রানি, সাইবার যৌন হয়রানী, মানসিক যৌন হয়রানি অন্তর্ভুক্ত। যৌন হয়রানির স্বীকার হওয়া ব্যক্তি নিজেকে গুটিয়ে নেয়, মানসিক চাপ, উদ্বেগ ও বিষণ্নতায় ভোগে। যৌন হয়রানি রোধ করতে হলে যৌন আচরণ প্রদর্শনকারী ব্যক্তির প্রতি দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ, আত্মবিশ্বাসের সাথে “না” বলতে শেখা, নিজেকে দোষারোপ না করা ইত্যাদি অনুশীলন করতে হবে।

[বিঃ দ্রঃ যৌন হয়রানি সম্পর্কিত কেস পৃষ্ঠা নং ৬৮ তে সংযুক্ত করা হয়েছে।]

মনোসামাজিক সহায়তার দক্ষতাসমূহ ও প্রক্রিয়া

সহমর্মীতা (Empathy)

যার মাধ্যমে আমরা অপর ব্যক্তির অনুভূতিকে তার অবস্থান থেকে তার মতো করে অনুভব করতে পারি।

Sympathy & Empathy (সমবেদনা এবং সহমর্মীতার মধ্যে পার্থক্য)

সমবেদনা= শুধুই অনুভূতি

সহমর্মীতা= অনুভূতি+তার অবস্থান থেকে তার মতো করে বোঝার ক্ষমতা

কেন আমাদের সহমর্মী হওয়া প্রয়োজন

- কার্যকরী বা ফলপ্রসূ যোগাযোগে খুবই সাহায্য করে
- মানসিকভাবে সমর্থন করে
- সেবাগ্রহীতাকে কথা বলার জন্য উৎসাহী করে
- কাজে অনুপ্রেরণা দেয়
- সেবাগ্রহীতা এবং সহায়তাকারীর মধ্যে বিশ্বস্ত সম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য করবে

সহমর্মী হবার ফলাফল

- আমরা সেবাগ্রহীতার অনুভূতিকে তার অবস্থান থেকে বুঝতে পারব
- সেবাগ্রহীতা তার ঘটনাকে বিস্তারিতভাবে বলতে উৎসাহী হবে
- সেবাগ্রহীতা বুঝতে পারবে যে সহায়তাকারী তার কথাগুলোকে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছেন
- সেবাগ্রহীতার পক্ষে কথা চালিয়ে যাওয়া সহজ হবে
- সেবাগ্রহীতার এবং সহায়তাকারীর মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য করবে

মূলবার্তা : সহমর্মীতামূলক আচরণ করা মনোসামাজিক সহায়তাকারীর এমন একটি দক্ষতা যার মাধ্যমে তিনি ক্লায়েন্টের জগৎ সম্পর্কে ধারণা লাভ করে ও সে অনুযায়ী তার সাথে প্রতিক্রিয়া করেন। মনোসামাজিক প্রক্রিয়াকে সফল করতে হলে সহমর্মীতা প্রদশর্নের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সহামর্মিতা প্রদানের মাধ্যমে সেবাগ্রহীতা ও সহায়তাকারীর মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি হয় যা সহায়তা প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

[বিঃ দ্রঃ সহমর্মীতা সম্পর্কিত কেস পৃষ্ঠা নং ৬৭ তে সংযুক্ত করা হয়েছে।]

▶ মনোযোগী শ্রবণ

এটি এমন একটি দক্ষতা যার মাধ্যমে শ্রোতা বক্তার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার সাথে সাথে সেই কথার অর্ন্তনিহিত অর্থও বুঝতে পারবেন। মনোযোগী শ্রবণ বলতে শুধু শোনা বা শ্রবণ করাকে বোঝায় না। এটা এমন একটি যোগাযোগের মাধ্যম, যার মাধ্যমে আমাদের সম্পূর্ণ মনোযোগ অংশগ্রহণকারীর কথার উপর থাকে এবং এর মাধ্যমে সহায়তাকারী সেবাগ্রহীতার বিষয়টা ভালোভাবে বুঝতে পারে ফলে সেবাগ্রহীতা তার অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে পারে।

কীভাবে আমরা মনোযোগী শ্রোতা হতে পারব

১। **প্রশ্ন করার মাধ্যমে :** অংশগ্রহণকারীর কথা শুনে তার কাছে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করার মাধ্যমে তার ঘটনাটা বিস্তারিতভাবে জানতে পারবেন। যেমন : কবে ঘটেছিল, কোথায় ঘটেছিল, কে করেছে? ইত্যাদি অংশগ্রহণকারীর কথার ফাঁকে ফাঁকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে ঘটনাটা বিস্তারিতভাবে জানতে পারবেন।

২। **Eye contact :** সঠিকভাবে eye contact করা খুবই জরুরি। ফলে সহায়তাকারী অন্যের কথা খুবই আগ্রহ নিয়ে শুনছেন তা প্রকাশ পায়। প্রত্যেক ৩/4 সেকেন্ড পর পর সরাসরি eye contact করা মনযোগী শ্রোতা হবার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৩। **মৌখিকভাবে বলা :** আমি তোমার সাথে আছি, তোমার অবস্থাটা আমি বুঝতে পারছি ইত্যাদি।

৪। **স্বাভাবিকভাবে বসা :** বসার দূরত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকা

৫। **অবহেলা প্রদর্শনমূলক আচরণ করা যাবে না :** আমাদের শারীরিক ভাষা বা body language/body movement, মুখভঙ্গী, হাত-পা দিয়ে এমন আচরণ করা যাবে না যার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা বোঝায়।

৬। **সঠিকভাবে শারীরিক ভাষা (posture)** প্রদর্শনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী সংকেত পায় যে অন্যের কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছে।

৭। **মুখের প্রকাশভঙ্গী (facial expression)** এর মাধ্যমে সংকেত পাওয়া যায় যে, অংশগ্রহণকারীর কথা শোনার জন্য প্রস্তুত আছে।

৮। **অংশগ্রহণকারীর অনুভূতির** কথা শুনে সেই অনুভূতিকে স্পর্শ করে কথা বলার মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে- অংশগ্রহণকারীর কথা অংশগ্রহণকারীর অবস্থান থেকে বুঝতে পারছেন।

যেমন : অংশগ্রহণকারী হয়ত বলল : "আমার বন্ধু আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করাতে আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি"। তখন বলা যেতে পারে- "আমি বুঝতে পারছি, তোমার বন্ধুর এ ধরনের আচরণে তুমি অনেক দুঃখ পেয়েছ, অনেক অপমানবোধ করেছ"।

৯। **সহমর্মীতার সাথে মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা :**

- খেয়াল করা- কীভাবে অংশগ্রহণকারী কথা বলছেন
- কোন কোন শব্দগুলোকে সে জোর দিয়ে বলছে, কোন কথার মাধ্যমে সে তার আবেগকে প্রকাশ করছে
- তার অভিজ্ঞতাকে বর্ণনা করতে গিয়ে সে কী কী শব্দ ব্যবহার করছে
- তার বসার ভঙ্গি খেয়াল করা
- মুখের ভঙ্গি খেয়াল করা

মূলবার্তা : সেবাগ্রহীতার কথা শোনা ও তার কথার অর্ন্তনিহিত অর্থ বোঝার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা হলো মনোযোগ দিয়ে শোনা। যার মাধ্যমে সহায়তাকারী এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেন যেখানে সেবাগ্রহীতা তার সকল বিষয় সাবলীলভাবে বলতে উৎসাহিত হন। কতগুলো কৌশল যেমন : প্রশ্ন করা, চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা, সঠিক শারীরিক ভাষা প্রদর্শন ইত্যাদি প্রয়োগের মাধ্যমে একজন সহায়তাকারী মনোযোগী শ্রোতা হতে পারেন।

▶ মূল্যবোধ

মূল্যবোধ হলো আমাদের বিশ্বাস, আদর্শ ও নীতি, যার প্রভাব আচরণের উপর পড়ে এবং জীবন পরিচালনায় সহায়তা করে। মূল্যবোধের আলোকে মানুষ তার জীবন পরিচালনা করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

মূল্যবোধের উৎস

পরিবার, বিদ্যালয়, সমাজ, ধর্ম, গোত্র/গোষ্ঠী, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইত্যাদির প্রভাবে আমাদের মূল্যবোধ তৈরি হয়। যেমন : পরিবারে একটি শিশুকে শেখানো হয় সব সময় সত্য কথা বলতে, বড়দের সম্মান করতে ইত্যাদি। আবার সমাজ থেকেও আমরা বিভিন্ন মূল্যবোধ শিখি, যেমন : বিয়ে, ধর্মীয় মূল্যবোধ, চুরি না করে সম্মানজনক কাজ করা, বয়স বা সম্পর্কে বড় কারও সামনে ধূমপান না করা ইত্যাদি।

দেশ, সমাজ , জাতি, ধর্ম ও বর্ণভেদে মূল্যবোধ ভিন্ন হতে পারে। যেমন : বাংলাদেশে বসবাসকারী মানুষেরা বড় পরিবারে থাকে আবার ইউরোপে বসবাসকারী মানুষেরা ছোট পরিবারেই বেশি থাকে। সনাতন ধর্মের মূল্যবোধে গরু মাতৃতুল্য এবং এই প্রাণীর মাংস খাওয়া নিষেধ; অন্যদিকে, খ্রিষ্ট ধর্মে ও ইসলাম ধর্মে এমন কোনো বিধি নিষেধ নেই। এবং বৌদ্ধ ধর্মের মূল্যবোধে যেকোনো প্রাণী হত্যাই মহাপাপ। এই মূল্যবোধগুলো আবার দেশ বা সমাজভেদে বিভিন্ন মাত্রায় পালিত হয়। সকল মূল্যবোধ থেকে নিজের স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত বিশ্বাস থেকে কিছু মূল্যবোধ তৈরি হতে পারে। এই বিভিন্নতাকে গ্রহণ এবং সম্মান করা বাঞ্ছনীয়। কারণ আমাদের প্রত্যেকের মূল্যবোধ নিজের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কারো মূল্যবোধকেই অপমান করা ঠিক নয়, কারণ তার মূল্যবোধ তার কাছে একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ যেমনটি আমার নিজের মূল্যবোধ আমার কাছে।

মূল্যবোধ এবং আচরণ

আমাদের আচরণ মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়। আমাদের প্রতিটি আচরণ আমাদের বিশ্বাসের প্রতিফলন। যেমন : মূল্যবোধ যদি হয় সকলকে সম্মান করা তাহলে আচরণ হবে অন্যের সাথে ভদ্রতার সহিত কথা বলা। মূল্যবোধ দ্বারা আচরণ প্রভাবিত হয়। কারণ আমাদের বিশ্বাসকে (মূল্যবোধ) আমরা কাজে বাস্তবায়ন করতে চাই। বিভিন্ন গবেষণায়ও মূল্যবোধ ও আচরণের সম্পর্ক পাওয়া গেছে।

তার মধ্যে একটি গবেষণা পরিচলনা করা হয় Values and Behavior: Strength and Structure of Relation (Anat Bardi and Shalom H. Schwartz, 2003) এই শিরোনামে। আমেরিকার উইস্‌কনসিন্‌ বিশ্ববিদ্যালয় এবং জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় যৌথ উদ্যোগে এই গবেষণা চালায়।

ফলাফলে, পাওয়া গেছে আমাদের প্রতিটি আচরণ কমবেশি কোনো না কোনো মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত, যেমন : ক্ষমতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, দৈনন্দিন অভ্যাস, রীতিনীতি, ঐতিহ্য, দানশীলতা ইত্যাদি। নিজের ও অন্যের মূল্যবোধ জানা ও বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

▶ মূল্যবোধ অনুসন্ধান

- আমার পরিবার থেকে আমাকে যে সকল মূল্যবোধগুলো দেয়া হয়েছে-

  ১।

  ২।

  ৩।

  ৪।

  ৫।

- আমি সমাজ থেকে যে সকল মূল্যবোধগুলো পেয়েছি-

  ১।

  ২।

  ৩।

  ৪।

  ৫।

- আমার নিজস্ব মূল্যবোধগুলো হলো-

  ১।

  ২।

  ৩।

  ৪।

  ৫।

- যে সকল মূল্যবোধের কারণে আমি আমার কর্মক্ষেত্রে/পারিবারিক ক্ষেত্রে/বন্ধুমহলে দ্বিধা-দ্বন্দের সম্মুক্ষীণ হয়ে থাকি-

  ১।

  ২।

  ৩।

  ৪।

নিরপেক্ষ আচরণ (Non-judgmental Behavior)

নিজের চিন্তা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং বিচার-বিবেচনাকে অপর ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার না করা বা চাপিয়ে না দেয়া। অর্থাৎ প্রতিটি মানুষই আলাদা, প্রত্যেকের চিন্তা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং বিচার-বিবেচনা করার ক্ষমতা আলাদা সেই বিষয়টির প্রতি সম্মান রেখে নিরপেক্ষ আচরণ করা।

নিরপেক্ষ হবার উপায়

- নিজের চিন্তা ও অনুভূতি সম্পর্কে সচেতন থাকা
- নিজের মূল্যবোধ এবং বিশ্বাস খুঁজে বের করা
- অন্যের ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করা এবং অন্যের মূল্যবোধের প্রতি সহনশীল থাকা
- মনোযোগী শ্রোতা হওয়া
- নিজের সাথে ইতিবাচক কথা বলা
- অন্যের প্রতি সহমর্মীতা প্রকাশ করা

মূলবার্তা : আমরা প্রতিটি মানুষ কতগুলো বিশ্বাস, আদর্শ ও নীতি ধারণ করে বড় হই যা আমাদের মূল্যবোধ হিসেবে পরিচিত। আমাদের মূল্যবোধ আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে যার দ্বারা আমাদের আচরণ পরিচালিত হয়ে থাকে। পরিবার, সমাজ, শিক্ষা, জাতি, ধর্ম, গোষ্ঠী, দেশ অনুযায়ী এই মূল্যবোধের ধরন আলাদা হয়ে থাকে এবং ব্যক্তি ব্যক্তিতেও পার্থক্য হয়ে থাকে। মূল্যবোধের কারণে একজন ব্যক্তি অনেক সময় পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করে ফেলতে পারে। নিজের মূল্যবোধের প্রতি সচেতনতা সৃষ্টি ও অন্যের মূল্যবোধের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে নিরপেক্ষ আচরণ করা সম্ভব।

[বিঃ দ্রঃ নিরপেক্ষতা সম্পর্কিত কেস পৃষ্ঠা নং ৬৪ ও ৬৫ তে সংযুক্ত করা হয়েছে।]

নৈতিকতা

নৈতিকতা হচ্ছে এমন এক প্রকার জ্ঞান যা নৈতিক সমস্যা ও বিচার বিবেচনা নিয়ে আলোচনা করে। একজন দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী, হোয়াইট (১৯৮৮), নৈতিকতাকে মানব আচরণের বিবর্তন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, যার দ্বারা আমরা আমাদের আচরণকে "ঠিক" বা "ভুল", অথবা "ভালো" কিংবা "খারাপ" হিসেবে ধরে নেই। আমরা সকলেই "সঠিক" পথে চলার চেষ্টা করলেও, বাস্তবে তা সুসম্পন্ন করার ভেতর অনেক ফাঁক থেকে যেতে পারে।

মনোসামাজিক সহায়তাকারীর দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে কিছু নৈতিক গুণাবলি সম্পর্কে জানা এবং দায়িত্ব গ্রহণের পর সেই নীতিগুলো পালন করা প্রতিটি মনোসামাজিক সহায়তাকারীরই কর্তব্য।

এ সকল নীতিগুলো হচ্ছে :

- **গোপনীয়তা রক্ষা করা :** ক্লায়েন্টের আস্থা অর্জন করা এবং ক্লায়েন্টের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করার জন্য গোপনীয়তা রক্ষা করা আবশ্যক। গোপনীয়তা বজায় রাখার মাধ্যমেই ক্লায়েন্টের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এবং তাঁর ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব। সেশনের কোনো তথ্য বাইরে কোথাও এবং কারো সাথে, কোনো অবস্থাতে আলোচনা করা যাবে না। যদি পরবর্তীতে কোনো কারণে, কোনো সেশনের ব্যাপারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে কোনো আলোচনার প্রয়োজন হয় তখন ক্লায়েন্টের নাম, ঠিকানা ইত্যাদি গোপন রেখে বিষয়টি আলোচনা করতে হবে।
- **প্রতিটি মানুষকে সমমর্যাদা দেয়া :** এই মূল্যবোধটির/নীতিটির অর্থ প্রতিটি ক্লায়েন্টের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে হবে। প্রতিটি ক্লায়েন্টের সাথে বয়স, লিঙ্গ, আর্থসামাজিক অবস্থা, জাতি, ধর্ম, মূল্যবোধ নির্বিশেষে সম আচরণ করতে হবে। কারো প্রতি কোনো ব্যক্তিগত অনুভূতি না রেখে বা পক্ষপাতী না হয়ে, প্রতিটি মানুষকে তাঁর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের জন্য সম্মান করতে হবে।
- **ব্যক্তি স্বাধীনতার মর্যাদা করা :** মানসিক স্বাস্থ্যসেবার একটি পূর্বশর্ত এই নীতিটির পালন। এর অর্থ এই যে, প্রতিটি ক্লায়েন্টের নিজস্ব জীবন যাপন করার পূর্ণ অধিকার আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর আচরণ অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে। ব্যক্তি স্বাধীনতার মর্যাদা করার মাধ্যমে মনোসামাজিক সহায়তাকারী তাঁর ক্লায়েন্টের আত্মনির্ভরশীলতা ও প্রশংসার দ্বারা আত্মশক্তি বৃদ্ধিতেও সহায়তা করতে পারেন।
- **ন্যায়পরায়ণ থাকা :** মনোসামাজিক সহায়তাকারী প্রতিটি ক্লায়েন্টের প্রতি সমানভাবে ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ থাকবেন এবং তাদের সাথে ঠিক সেই আচরণই করবেন যেমনটি তাঁরা ঐরূপ পরিস্থিতিতে নিজেদের ক্ষেত্রেও আশা করবেন।
- **আস্থা ও আন্তরিকতা বজায় রাখা :** মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের কাজ সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে যেখানে ক্লায়েন্টরা যথাসম্ভব নিরাপদ বোধ করেন এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে মনোসামাজিক সহায়তাকারীর সাথে আলোচনা করতে পারেন, যা আস্থা ও আন্তরিকতা বজায় রাখার মাধ্যমেই সম্ভব। নির্ভরযোগ্যতা, বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা এবং প্রতিশ্রুতি পালন এই সকল গুণাবলির দ্বারা মনোসামাজিক সহায়তাকারী ক্লায়েন্টদের আস্থা অর্জন করতে পারেন এবং মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য উপযোগী সুসম্পর্ক ও পরিবেশ তৈরি করতে পারেন।
- **সহমর্মীতার সাথে আচরণ করা :** মনোসামাজিক সহায়তাকারীর কাজের একটি অন্যতম পূর্বশর্ত হলো সকল ক্লায়েন্টের সাথে সহমর্মীতার সাথে আচরণ করা এবং এর পাশাপাশি পেশাদারী মনোভাব বজায় রাখা।
- **নিজের আচরণের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করা :** যেকোন পরামর্শ প্রদানের পূর্বে মনোসামাজিক সহায়তাকারীর অবশ্যই তাঁর প্রদানকৃত পরামর্শের ফলাফল বিবেচনা করতে হবে। যদি মনোসামাজিক সহায়তাকারী কখনো কোনো অনুপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করে থাকেন তবে তিনি যেন বিচলিত না হয়ে, নিজ আচরণের কারণ হিসেবে অপরকে দোষারোপ না করে এবং কোনো অজুহাত না দেখিয়ে সাহসিকতার সাথে নিজের আচরণের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মূলবার্তা : মনোসামাজিক সহায়তা প্রক্রিয়া কতগুলো নৈতিকতা যেমন : গোপনীয়তা রক্ষা করা, সবাইকে সমান মর্যাদা দেয়া, ন্যায়পরায়ণ থাকা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয় যা সহায়তা প্রক্রিয়াকে দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। এই নৈতিকতা সহায়তাকারীকে দায়িত্বশীল করে তোলার মাধ্যমে কোন পরিস্থিতিতে কোন ধরনের প্রতিক্রিয়া করতে হবে সে সম্পর্কে সচেতন থাকতে সহায়তা করে।

[বিঃ দ্রঃ নৈতিকতা সম্পর্কিত কেস পৃষ্ঠা নং ৬৫ ও ৬৬ তে সংযুক্ত করা হয়েছে।]

মনোসামাজিক সহায়তার প্রক্রিয়া

মনোসামাজিক কাউন্সেলিং রুমের পরিবেশ

মনোসামাজিক কাউন্সেলিং কক্ষের পরিবেশ মনোসামাজিক সহায়তা প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা মনোসামাজিক সহায়তা প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে থাকে। যে কক্ষে মনোসামাজিক সহায়তা দেওয়া হবে তার পরিবেশ মনোসামাজিক সহায়তা প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে এবং বাধাও দিতে পারে। যে কক্ষে মনোসামাজিক সহায়তা দেওয়া হবে তার পরিবেশ কেমন হবে সে ব্যাপারে সর্বজনীন কোনো নিয়ম নেই। Shertzer & Stone (1980) এর মতে, কক্ষটা অবশ্যই আরামদায়ক এবং আকর্ষণীয় হবে। কিছু কিছু মনোসামাজিক সহায়তা কক্ষে হালকা রং, মৃদু আলো, আরামদায়ক আসবাবপত্র এবং শব্দ না হওয়ার ব্যবস্থা থাকে। মনোসামাজিক সহায়তাকারী ও ক্লায়েন্টের মধ্যকার দূরত্ব মনোসামাজিক সহায়তা সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে পারে। কক্ষের আরাম মনোসামাজিক সহায়তা প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এছাড়াও আরামের মাত্রা সাংস্কৃতিক পটভূমি, লিঙ্গ এবং সম্পর্কের প্রকৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। Shertzer & Stone (1980) আরো বলেছেন, উভয় লিঙ্গের মনোসামাজিক সহায়তাকারী ও ক্লায়েন্টের মধ্যে ৩০-৩৯ ইঞ্চি দূরত্ব থাকলে আরাম অনুভব হয়। অনেকের মতে কক্ষে দু'টি চেয়ার এবং একটি টেবিল থাকবে। চেয়ারগুলো এমনভাবে সাজানো থাকবে যাতে ৯০ ডিগ্রি কোণে বসতে পারে। কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। টেলিফোন বন্ধ থাকবে এবং রুমে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। তাদের অবস্থান ও কথাবার্তা অন্য কোনো ব্যক্তি দেখতে বা শুনতে পারবে না অর্থাৎ গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।

ক্লায়েন্টের সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক স্থাপন করা

- ক্লায়েন্টকে উষ্ণতার সাথে এবং প্রাণবন্তভাবে অভ্যর্থনা জানানো, প্রশংসামূলক কথাবার্তা বলা এবং নিজের পরিচয় দেয়া। এরপর-
- ক্লায়েন্টের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং বোঝা
- ক্লায়েন্টকে মুক্ত প্রশ্ন করা
- ক্লায়েন্টকে সহমর্মীতা প্রদর্শন করা
- ক্লায়েন্টের সাথে নিরপেক্ষ থাকা

ক্লায়েন্টের সম্মতি পত্র

ক্লায়েন্টের সম্মতি নেয়া হলো- মনোসামাজিক সহায়তার একটি চলমান প্রক্রিয়া। ক্লায়েন্টকে মনোসামাজিক সহায়তাকারী সেশন সম্পর্কে সকল তথ্য মৌখিক অথবা লিখিতভাবে উপস্থাপন করে সম্মতি নিতে পারেন। সম্মতি নেয়ার পূর্বে ক্লায়েন্টকে মনোসামাজিক সহায়তাকারী সহায়তার প্রক্রিয়া, লক্ষ্য, তার দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানাবেন। ক্লায়েন্টের গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে এবং কখন তা ভঙ্গ করতে হবে সে সম্পর্কে জানাবেন। প্রয়োজনে কারো কাছে রেফার করা হতে পারে তা জানিয়ে রাখা। থেরাপিউটিক প্রয়োজনে ক্লায়েন্টের তথ্য নথিভুক্ত করা হবে এবং কখনো কখনো তা রেকর্ডও করা হতে পারে তা ক্লায়েন্টকে অবহিত করা এবং অনুমতি গ্রহণ করা। তার প্রদত্ত সকল তথ্য যে সুরক্ষিত থাকবে সে সম্পর্কে নিশ্চিত করা। যদি ক্লায়েন্টের কোনো তথ্য কোনো গবেষণা কাজে ব্যবহার করা হয় তবে অবশ্যই তার পরিচয় গোপন রেখে প্রকাশ করা হবে।

সেশনের দৈর্ঘ্য, সংখ্যা, ফি সম্পর্কে ক্লায়েন্টকে যথাযথ তথ্য প্রদানের মাধ্যম তার কাছ থেকে মৌখিক বা লিখিতভাবে সম্মতি নেয়া। এক্ষেত্রে সেশন গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষেত্রে ক্লায়েন্টের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে সিদ্ধান্ত নেবার।

ক্লায়েন্টকে উৎসাহ প্রদান করা

সেশন চলাকালীন সময়ে ক্লায়েন্টকে তার যেকোনো আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য প্রশংসা করা এবং মৌখিকভাবে উৎসাহ প্রদান করা। এতে ক্লায়েন্ট সেশনে আরও উৎসাহিত হবেন এবং নিজের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে নিজে দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে যাবেন।

ক্লায়েন্টের মধ্যকার বৈপরিত্য লক্ষ্য করা

অনেক সময় ক্লায়েন্ট বিপরীতমুখী চিন্তার ফাঁদে আটকা পড়ে যায়। তারা কখনও নিজেদের আচরণ পরিবর্তনের পক্ষে আবার কখনো নিজেদের আচরণ পরিবর্তনের বিপক্ষে যাবার কথা ভাবতে থাকে। এই বিপরীতমুখী চিন্তা ক্লায়েন্টের দুশ্চিন্তা এবং অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় ক্লায়েন্টের আচরণ পরিবর্তনের জন্য যুক্তিতর্ক দিলে ক্লায়েন্ট যুক্তির বিরোধীতা করবেন এবং তারা তাদের বক্তব্যের সমর্থনের জন্য আপনাকে যুক্তি দেখাবেন। এমতাবস্থায় ক্লায়েন্ট তার আচরণ পরিবর্তনের জন্য উৎসাহ পাবেন না এবং অস্বস্তিকর বা অস্বাস্থ্যকর আচরণের দিকে ঝুঁকে থাকবেন। এসময়-

- নিরপেক্ষ থেকে সহমর্মীতার সাথে ক্লায়েন্টের কথা শুনতে হবে
- ক্লায়েন্টকে আত্ম-উপলব্ধির জন্য সময় দিতে হবে এবং তাকে উৎসাহ প্রদান করতে হবে

যেকোনো তথ্য দেবার আগে ক্লায়েন্টের অনুমতি নেওয়া

যেকোন তথ্য দেবার আগে ক্লায়েন্টের অনুমতি প্রার্থনা করা এবং ক্লায়েন্টের স্বাধীনতা ও মতামতকে গুরুত্ব দেয়া।

অধিবেশনের সমাপ্তি : প্রশংসা ও বর্তমান সেশনে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত করা।

প্রশংসা ও স্বীকৃতি

প্রশংসা ও স্বীকৃতির একটি প্রধান একক হলো স্ট্রোকস। স্ট্রোকস বলতে আমরা বুঝি কোনো ব্যক্তিকে তার নির্দিষ্ট একটি গুণের প্রশংসা করে বা স্বীকৃতি প্রদান করে তাকে উৎসাহিত করা। এটা আমাদের অনুভূতি পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন : "আপনি একজন কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি", "আপনি একজন সৎ ব্যক্তি" ইত্যাদি।

পেশাবান্ধব পরিবেশ (SOLER)

ফলপ্রসূ সহায়তার ক্ষেত্রে "SOLER" এর ভূমিকা অপরিহার্য। সহায়তাকারী সেবাগ্রহীতার সামনে নিজেকে কীভাবে সেবা প্রদান করার জন্য উপস্থাপন করবেন সেজন্য "SOLER" একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা।

নিম্নে "SOLER" এর বর্ণনা দেয়া হলো :

SOLER Activity

- S= Sitting position- বসার ভঙ্গি। সহায়তাকারী যখন সেশনে বসবেন তখন মুখোমুখি না বসে একটু বাঁকা হয়ে অর্থাৎ L-shape এ বসবেন। সরাসরি/মুখোমুখি বসলে সেবাগ্রহীতা অস্বস্তিবোধ করতে পারেন
- O= Open posture- জড়তাহীনভাবে বসা, হাত-পা গুটিয়ে না রাখা
- L= Lean forward- সামনের দিকে ঝুঁকে থাকা, যেন মনে হয় - কথা শুনতে আগ্রহী
- E= Eye contact- দৃষ্টি বিনিময়। দৃষ্টি বিনিময়ের ফলে অন্যের কথা খুবই আগ্রহ নিয়ে শুনছেন তা প্রকাশ পায়
- R= Relax- শান্ত থাকা, মানসিক ও শারীরিকভাবে শিথিল থাকা। অস্থিরতা প্রদর্শন না করা।

মনোসামাজিক সহায়তাকারী এবং ক্লায়েন্টের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা

মনোসামাজিক সহায়তাকারী সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে নানা ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারেন। মনোসামাজিক সহায়তাকারীর পেশাগত দায়িত্ব হলো নিজের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া। বাস্তবিক অর্থে, এটা বলতে বোঝায় যদি মনোসামাজিক সহায়তাকারী উদ্বিগ্ন থাকেন, তবে তিনি তা কাউকে বলতে পারেন। যদি কোনো তথ্য দরকার হয়, কারো মতামতের দরকার হয়, কারো সমর্থন দরকার হয়, তবে তিনি চাইতে পারেন। যদি অনিরাপদ বোধ করেন, তাহলে নিরাপত্তা চাইতে পারেন।

একজন মনোসামাজিক সহায়তাকারী নিজের সুরক্ষার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো নিতে পারেন :

- ক্লায়েন্টের আক্রমণাত্মক ও ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ সঠিকভাবে শনাক্ত করা ও বোঝা
- এজেন্সির নিরাপত্তা প্রক্রিয়া সম্পর্কে জেনে নেওয়া
- যখন অফিসে সিনিয়র কর্মীরা উপস্থিত থাকেন তখন নতুন কোনো ক্লায়েন্টের এপয়েন্টমেন্ট নেওয়া
- সেশন শুরু করার আগে অভ্যর্থকের কাছ থেকে ক্লায়েন্ট সম্পর্কে জেনে নেওয়া যে, ক্লায়েন্টকে দেখতে কেমন লাগছিল, ওয়েটিং রুমে কেমন আচরণ করছিল, এবং তার মধ্যে কোনো অসংলগ্নতা লক্ষ্য করা গিয়েছে কি না ইত্যাদি
- ক্লায়েন্টের সাথে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা
- সেশন চলাকালীন সময়ে নিজের হাত দৃশ্যমান রাখা
- কোনো প্ররোচণামূলক অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন না করা
- রুমের এমন জায়গায় বসা যাতে সহজে বের হওয়া যায় (দরজার পাশে বসা)
- কোনো উত্তেজক মন্তব্য না করা

British Association for Counselling and Psychotherapy-এর মতে, ক্লায়েন্ট ও মনোসামাজিক সহায়তাকারীর সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নোক্ত নীতিমালাগুলো অনুসরণীয়-

বিশ্বাসযোগ্য হওয়া : ক্লায়েন্টের প্রতি বিশ্বাসযোগ্য আচরণ করা। বিশ্বাসযোগ্যতা হলো কোনো সমস্যা বোঝা ও সমাধানের মৌলিক বিষয়। ক্লায়েন্টের বাস্তবিক প্রত্যাশাগুলো পূরণ নিশ্চিতকরণ, ক্লায়েন্টকে দেওয়া প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতিগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। ক্লায়েন্টের গোপনীয় তথ্যগুলো তার অনুমতি ছাড়া প্রকাশ না করা।

ব্যক্তি স্বাধীনতা : মানসিক স্বাস্থ্যসেবার একটি পূর্বশর্ত এই নীতিটির পালন। এর অর্থ এই যে, প্রতিটি ক্লায়েন্টের নিজস্ব জীবন যাপন করার পূর্ণ অধিকার আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর আচরণ অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে। ব্যক্তি স্বাধীনতার মর্যাদা করার মাধ্যমে মনোসামাজিক সহায়তাকারী তাঁর ক্লায়েন্টের আত্মনির্ভরশীলতা ও প্রশংসার দ্বারা আত্মশক্তি বৃদ্ধিতেও সহায়তা করতে পারেন।

মঙ্গলসাধন করা : ক্লায়েন্টের কল্যাণ (Wellbeing) বৃদ্ধির জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া। কার্যকরী ফলাফল পাওয়ার জন্য ক্লায়েন্টের ইচ্ছাকে সর্বোচ্চ মূল্যায়ন করা। নিজের সীমাবদ্ধতার প্রতি সচেতন থেকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সহায়তা প্রদান করা। পেশাগত উন্নতি ও সহায়তার গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত সুপারভিশন নেওয়া ও সহায়তা সম্পর্কিত নানা বিষয়ে আপডেট থাকা।

ক্লায়েন্টের কোন ক্ষতি না করা

ক্লায়েন্টের কোনো ধরনের ক্ষতি না করার প্রতিজ্ঞা করা। ক্লায়েন্টের সাথে কোনো ধরনের যৌন, অর্থনৈতিক, আবেগীয়, ও অন্যান্য শোষনমূলক আচরণ করা থেকে বিরত থাকা। কোনো বিষয়ে অদক্ষতা থাকলে সহায়তা না দেওয়া ও দক্ষতার অপব্যবহার না করা। অসুস্থতা, ব্যক্তিগত নানা অসুবিধা বা মাদকদ্রব্য সেবন অবস্থার কারণে ব্যক্তি সেবা প্রদানে অনুপযোগী থাকলে সহায়তা প্রদান না করা।

ন্যায়পরায়ণতা

প্রতিটি ক্লায়েন্টকে সমানভাবে বিচার করা ও সকল ক্লায়েন্টের প্রতি সমানভাবে ন্যায়পরায়ণ থাকা এবং তাদের মানবাধিকার ও মর্যাদাকে সম্মান করা। সকলকে সমান সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে নিরপেক্ষভাবে সেবা দেওয়া। কোনো ব্যক্তি বা দলকে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অন্যান্য বৈশিষ্টের ভিত্তিতে বৈষম্য করা থেকে বিরত থাকা।

আত্মসম্মানবোধ

মনোসামাজিক সহায়তাকারীকে উপরোক্ত প্রতিটি নীতিমালা নিজের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে হবে। নিজের পেশাগত উন্নতির জন্য নিয়মিত নানা ধরনের কাউন্সেলিং সেবা নেওয়া, থেরাপি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নেওয়া এবং সুপারভিশন নেওয়া। নানা ধরনের আত্ম-সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়া।

মূলবার্তা : মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ায় কতগুলো বিষয় লক্ষ্য করাটা জরুরি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে কাউন্সেলিং রুমের পরিবেশ। রুমের পরিবেশটি অবশ্যই আরামদায়ক হবে যেখানে ক্লায়েন্ট মন খুলে কথা বলতে পারবে। মনোসামাজিক সহায়তাকারী ক্লায়েন্টকে উষ্ণতার সাথে গ্রহণ করে, মনোযোগ দিয়ে শুনে এবং সহমর্মীতা দেখিয়ে ইতিবাচক সম্পর্ক স্থাপন করবেন। সহায়তাকারী ক্লায়েন্টকে সেশনের প্রক্রিয়া, তার দক্ষতা, সীমাবদ্ধতা, গোপনীয়তা ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করার মাধ্যমে মৌখিক ও লিখিত সম্মতি নিবেন। এক্ষেত্রে সহায়তাকারী ক্লায়েন্টকে উৎসাহ দেন, কোনো বৈপরিত্য আচরণ আছে কি না তা লক্ষ্য করেন, তথ্য দেবার আগে অনুমতি নেন, প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশংসা ও স্বীকৃতি প্রদান করবেন।

সহায়তা প্রক্রিয়া স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করার জন্য সহায়তাকারী বসার ক্ষেত্রে বিশেষ এক ধরনের নিয়ম অনুসরণ করে থাকেন যাকে সংক্ষেপে SOLER বলে।

সহায়তা প্রক্রিয়ায় সহায়তাকারী ও ক্লায়েন্টের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য কতগুলো নীতি অনুসরণ করতে হয় যেমন : নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা, বিশ্বাসযোগ্য হওয়া, ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করা, মঙ্গল সাধনে কাজ করা, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি।

▶ আত্মপরিচর্যা (self-care)

সেল্‌ফ কেয়ার বা আত্মপরিচর্যা মানে কী?

আত্মপরিচর্যা হলো মানসিক চাপ থেকে কিছুটা স্বস্তি পাওয়ার জন্য বা নিজেকে কর্মোদ্যোগী করে তোলার ক্ষেত্রে নিজের জন্য কিছু করা বা নিজেকে কিছুটা সময় দেওয়া।

মনোসামাজিক সহায়তাকারী হিসেবে আমরা অন্য ব্যক্তিকে তার মানসিক বিপর্যয়ের সময় সাহায্য করে থাকি, আমরা তাকে সহমর্মীতা প্রদান করে থাকি। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বয়স, কাজ নির্বিশেষে আমরা তাকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করে থাকি। স্বাভাবিকভাবে এই সকল কাজ খুব সাধারণ মনে হলেও কিন্তু এটি আসলে খুব চাপমূলক কাজ। কারণ, আমরা অন্যের দুঃখের, কষ্টের, নির্যাতনের, ব্যথার কথা শুনে থাকি। মনোসামাজিক সহায়তা কোনো একপাক্ষিক সেবা নয়; কারণ এখানে সহায়তা গ্রহণকারী ও প্রদানকারী উভয়েই মনের ভীষণ গভীরের কথাগুলো বলে থাকেন, যে কথাগুলো অন্য কারো সাথে বলা সম্ভব নয়। মনোসামাজিক সহায়তাকারী যখন এই একান্ত কথাগুলো শুনে থাকেন, তার মানে হচ্ছে, তিনি নিজেও সহায়তা গ্রহণকারীর মতো একই মানসিক অবস্থার মধ্যে ওই মুহূর্তে আছেন। কারণ, ক্লায়েন্ট যে অনুভূতি নিয়ে কথা বলছে, তা অনুভব করে সেবা দিতে হয় সাহায্যকারীকে।

ক্লায়েন্ট তাঁর মানসিক যন্ত্রণার কথাগুলো সাহায্যকারীকে বলে শান্ত হতে পারেন, কিন্তু সাহায্যকারী নৈতিকতার জন্য এই কথাগুলো অন্য কারো কাছে বলতে পারেন না। এমনকি, ক্লায়েন্টের কথা শুনে যদি সাহায্যকারী মানসিকভাবে যন্ত্রণা বোধ

করেন, তাহলেও তিনি পেশাগত নৈতিকতার কারণে দক্ষ কাউন্সেলিং মনোবিজ্ঞানী ছাড়া অন্য কারো সাথে এই অনুভূতির কথাটি প্রকাশ করতে পারেন না। তিনি যদি নিজের মধ্যে সকল নেতিবাচক অনুভূতি জমিয়ে রাখেন ও সেইগুলো নিয়ে চিন্তা করতে থাকেন, তাহলে সময়ের সাথে সাথে তাঁর কাজের দক্ষতা লোপ পাবে। শুধু তাই নয়, তিনি মানসিকভাবে যদি বিপর্যস্ত বোধ করেন, তাহলে অন্য ব্যক্তিকে তিনি সহায়তা প্রদান করতে পারবেন না। তাই সহায়তাকারীকে সবসময় মনে রাখতে হবে, নিজের জন্য এমন কিছু কাজ করা জরুরি, যা তাকে মানসিক চাপ থেকে কিছুটা হলেও স্বস্তি দেবে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি নিম্নোক্ত দুইটি কারণে সেলফ কেয়ার বা মানসিকভাবে নিজের যত্ন নেয়া প্রয়োজন :

১। দীর্ঘদিন অন্য ব্যক্তির মানসিক যন্ত্রণার কথা শুনতে থাকলে সহায়তাকারীর নিজের মধ্যেও নেতিবাচক অনুভূতি ও চিন্তা জমা হতে থাকে। তিনি যদি এই চিন্তা ও অনুভূতিগুলো নিয়ে কাজ না করে থাকেন, তাহলে একসময় তার নিজের কাজ করার দক্ষতা কমে যাবে। মনে রাখা দরকার, একজন ব্যক্তি যখন নিজে মানসিকভাবে সুস্থ থাকেন ও ইতিবাচক চিন্তার অধিকারী থাকেন, শুধু তখনই তার পক্ষে সম্ভব হয় অন্যের প্রতি সমমর্মীতা প্রকাশ করা। এছাড়াও নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর এই কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ কারো কাছ থেকে ক্লিনিক্যাল সুপারভিশন নিলে একজন মনোসামাজিক সহায়তাকারী মানসিক চাপ মোকাবিলা করার মাধ্যমে ফলপ্রসূভাবে সহায়তা প্রদান করতে পারেন।

২। নেতিবাচক চিন্তা ও অনুভূতি দ্বারা নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখলে তা একসময় মানসিক রোগ বা psychotic disorder এ পরিণত হতে পারে।

- **সেলফ কেয়ারের কিছু পদ্ধতি**

১। রিলাক্সেসন

- প্রথমে আরাম করে বসুন
- এরপর ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করুন
- এরপর শ্বাসের দিকে গভীর মনোযোগ দিন। (সাধারণত আমরা যখন শ্বাস নিই তখন আমাদের বুক ফুলে ওঠে। রিলাক্সেসন এক্সারসাইজে শ্বাস নিবার সময় পেটও ওঠা নামা করবে)
- বড় করে শ্বাস নিই, এরপর মুখ দিয়ে শ্বাস বের করে দেই
- আপনি যখন শ্বাস নিবেন তখন মনে করবেন যে ঠান্ডা, সুবাতাস আপনার নাক দিয়ে ঢুকে পেট পর্যন্ত চলে যাচ্ছে এবং পেট বেলুনের মতো ফুলে উঠছে
- মনে করুন- আমার চারিদিকে ঠান্ডা বাতাস; ঠান্ডা বাতাস আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ছুঁয়ে যাচ্ছে
- আমার চারিদিকে অনেক পাখি, পাখিরা সব কিচির-মিচির করছে
- আমার খুব শান্তি লাগছে
- ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ুন
- আপনি যখন শ্বাস ত্যাগ করবেন তখন মনে করবেন যে, আপনার সব দুঃখ, কষ্ট, বেদনা, টেনশন, সব শ্বাসের সাথে বের হয়ে যাচ্ছে।
- এ পুরা প্রক্রিয়াটি অন্ততঃপক্ষে পাঁচবার করুন

২। নিজের ভালোলাগা বা পছন্দের বিষয়গুলোকে নতুন করে আবিষ্কার করুন

সব সময় নিজের জন্য কিছু সময় বরাদ্দ রাখুন, ওই সময়টুকু ব্যয় করুন নিজের ভাললাগার কোনো কাজে। হতে পারে আপনি পছন্দের কোনো গান শুনলেন, অথবা নিজের টেবিলের ফুলগুলো নতুন করে সাজালেন। যখন মানসিকভাবে ক্লান্তবোধ করবেন, চেষ্টা করুন কাছের মানুষের সাথে হাল্কা/মজার গল্প করতে। নিজেকে উপহার দিন। হাসতে ভুলবেন না, নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে ভুলবেন না। পছন্দের বই পড়ুন, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সবার সাথে মেশার চেষ্টা করুন। যে সকল ব্যাপার নেতিবাচক মনে হয়, তা থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন।

মনে রাখবেন, নিজের জন্য সময় ব্যয় করা কিন্তু দোষের কিছু নয়। নিজের ভালোলাগার কাজ নিয়ে কথা বলা অপরাধের কিছু নয়, যদি না তা অন্য কোনো ব্যক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। একজন শিক্ষক যে ধরনের কাজ করেন, তাকে সেক্ষেত্রে মানসিকভাবে অনেক সবল থাকতে হয়, যেন তিনি অন্য ব্যক্তিকে সবল থাকার মতো মানসিক শক্তি যোগাতে পারেন। সুতরাং নিজের যত্ন নিন, আর অন্যকেও মানসিকভাবে সুস্থ থাকার সুযোগ করে দিন।

মূলবার্তা : সহায়তাকারী অনেক ধরনের মানুষের কথা শুনে থাকেন, যা তার মধ্যে মানসিক চাপ তৈরি করতে পারে। তাই একজন সহায়তাকারীর আত্মপরিচর্যার গুরুত্ব অপরিসীম যা তাকে মানসিক চাপ থেকে বের হয়ে এসে কর্ম উদ্যোগী করে তোলে। আত্মপরিচর্যার জন্য সহায়তাকারী ব্যায়াম করা, রিলাক্সেসন করা, নিজের ভাললাগার বিষয়গুলোর সাথে কিছুটা সময় কাটানো, ঘুরতে যাওয়ার মতো বিষয়গুলোকে বেছে নিতে পারেন।

কেসসমূহ

নিরপেক্ষতা

কেস -১

সাদিয়া এবং সুজন একই ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রী। তাদের দু'জনেরই পড়াশোনার ব্যাপারে সুনাম ছিলো। প্রথম বা দ্বিতীয় অবস্থানের মধ্যেই তারা থাকত। একদিন তাদের শ্রেণিশিক্ষক বৃত্তির ব্যাপারে কথা বলে, যদিও আর্থিক প্রয়োজন এবং শিক্ষাগত দিক থেকে যোগ্যতা সমান ছিল কিন্তু শিক্ষকরা সুজনের সাথে ভালো সম্পর্ক থাকার পাশাপাশি একজন মেয়ে হিসেবে সাদিয়া হয়তো খুব বেশি পড়াশোনা করবে না তাই তাকে নির্বাচিত না করে সুজনকে নির্বাচিত করে। বিষয়টি নিয়ে সাদিয়া খুব কষ্ট পায় এবং এটি তার পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটাতে শুরু করে। স্কুলে সে বিষণ্ন থাকে এবং পড়াশোনায় মনোযোগ কমে যায়। এতে করে তার পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হয়। শিক্ষকরা তাকে অমনোযোগিতার জন্য বকা দেয়।

প্রশ্ন : সাদিয়ার শিক্ষক এখানে নিরপেক্ষ থাকতে পেরেছেন কি?

প্রশ্ন : নিরপেক্ষতা কি লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে পারে?

কেস-২

সনিয়া একটি বেসরকারি স্কুলের ছাত্রী। সনিয়াদের স্কুলে সহশিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত। যদিও ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীরা একইসাথে ক্লাশ করত কিন্তু তাদের প্রতি মনোযোগ সমানভাবে দেয়া হতো না। যেমন : তাদের শ্রেণিতে ক্যাপ্টেন একজন ছেলে। বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের জন্য ছেলেদের যতটা সুযোগ সুবিধা দেয়া হয় মেয়েদের ক্ষেত্রে তা হয় না। খেলাধুলাতে একজন ছেলের অংশগ্রহণকে যতটা উৎসাহিত করা হয় মেয়েদের ক্ষেত্রে হয় তার উল্টো। এই বিষয়গুলো নিয়ে সনিয়ার মধ্যে হীনমন্যতা কাজ করতে শুরু করে এবং সে ভাবতে শুরু করে যেহেতু সে মেয়ে তাই তার পক্ষে কখনোই বড় ধরনের কোনো কাজ করা সম্ভব হবে না। এতে করে তার মানসিক অবস্থা ধীরে ধীরে খারাপ হতে থাকে এবং সে পড়াশোনায় নিরুৎসাহিত হতে থাকে।

প্রশ্ন : লেখাটি পড়ে আপনার কী মনে হয়েছে?

প্রশ্ন : এই পরিস্থিতিতে শিক্ষকদের করণীয় কী?

কেস -৩

রাহিমা পরিবারের বড় মেয়ে। সে এখন ক্লাস নাইনে পড়াশোনা করে। তবে তার পড়ালেখার ভবিষ্যৎ নিয়ে সে খুবই চিন্তিত। তার বাবা-মা তাকে মাধ্যমিকের বেশি পড়াতে আগ্রহী নন। তারা রাহিমার ছোট ভাইকে উচ্চ শিক্ষিত করতে আগ্রহী। কারণ তারা মনে করে উচ্চ শিক্ষিত হলেও রাহিমা ভালো কোনো চাকরি করতে পারবে না এবং তাদেরকে যথেষ্ট সহায়তা করতে পারবে না। তাদের সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ অংশ একমাত্র ছেলেকে পড়াতে কাজে লাগাতে চায়। এতে করে রাহিমার মধ্যে মানসিক যন্ত্রণা তৈরি হয়। সে ভাবতে শুরু করে আজ শুধুমাত্র মেয়ে বলে সে পড়াশোনা করতে সুযোগ পাবে না। এতে করে সে পড়াশোনায় মনোযোগ হারিয়ে ফেলে এবং তার জীবনের অন্যান্য কাজের প্রতি আগ্রহ কমে যায়। সে এটাও ভাবতে শুরু করে যে সে সারাজীবন এভাবেই ছেলেদের চাইতে পিছিয়ে থাকবে। এক পর্যায়ে সে স্বাভাবিক জীবনযাপনের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং তার মধ্যে বিষণ্নতা ও আত্মহত্যা প্রবণতা দেখা দেয়।

প্রশ্ন : এই পরিস্থিতিতে একজন শিক্ষকের ভূমিকা কী হতে পারে?

প্রশ্ন : রাহিমার পরিবারের নিরপেক্ষ চিন্তা কেমন হতে পারে?

গোপনীয়তা

কেস-১

রায়হানা একটি স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। ইদানীং সে তার মধ্যে কিছু শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্তন অনুভব করছে। কিছু বিষয় নিয়ে সে তার মা এবং বড় বোনের সাথে কথা বললেও তার মধ্যে এখনো অনেক দ্বিধা রয়েছে। কিন্তু সে কার সাথে কথা বলবে তা বুঝতে পারছে না। তার কাছে মনে হয় যারাই এই বিষয়গুলো শুনবে তারা উপহাস করবে এবং বিদ্রুপ করবে। এই চিন্তাগুলো তার মধ্যে সব সময় চলতে থাকে। এতে করে তার পড়ালেখাসহ দৈনন্দিন জীবনের অনেক কাজ ব্যাহত হয়। সে কষ্ট পেলেও কী করবে বুঝতে পারে না। একদিন একজন শিক্ষিকার সাথে সে তার সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলে। এতে করে সে বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা পায় এবং তার দ্বিধা দূর হয়। সেদিন শিক্ষকদের কক্ষের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে শুনতে পায় সে যাকে তার সব কথাগুলো বলেছিল সেই কথাগুলো অন্য একজন শিক্ষকদের সাথে আলোচনা হচ্ছে এবং এ নিয়ে সবাই হাসি ঠাট্টা করছে। এতে সে খুব কষ্ট পায় এবং অপমানিত বোধ করে। সে সিদ্ধান্ত নেয় আর কখনো কারো সাথে গোপন বিষয়ে কথা বলবে না।

প্রশ্ন : লেখাটি পড়ে আপনার কী মনে হয়েছে?

প্রশ্ন : এখানে গোপনীয়তা কী কারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল?

কেস-২

রিনা ক্লাস নাইনের একজন ছাত্রী। তার বাসার সবার অজান্তে সে একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খোলে। যদিও প্রথমে সে নিজের নাম বা ছবি ব্যবহার করেনি কিন্তু ধীরে ধীরে সে নিজের ছবি ব্যবহার শুরু করে। অনেক নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হয় ফেসবুকের মাধ্যমে। ধীরে ধীরে তার সাথে একজন ছেলের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রথমে সেটি শুধুমাত্র কথায় সীমাবদ্ধ থাকলেও ধীরে ধীরে ছেলেটির চাওয়া বাড়তে থাকে। একটা সময় যখন তার সব চাওয়া পূর্ণ করতে পারছিল না তখন ছেলেটি তার ছবি ও তাদের কথার স্ক্রিনশট ফেসবুকে শেয়ার করে। মেয়েটি প্রথমে বিষয়টি জানতে না পারলেও যখন তার বন্ধুরা বিদ্রুপ শুরু করে তখন সে জানতে পারে এবং সে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পরে তার মনে তখন খুব দ্রুত সব চিন্তা চলছিল। এখন কী হবে, সব শেষ, কেউ তাকে সাহায্য করবে না, পরিবারের সবাই তার উপর রাগ করবে এবং তার জীবনে বিষয়টি কালিমা লেপন করে দিয়েছে। কিছুদিন এভাবে যাওয়ার পর সে আত্মহত্যার কথা ভাবতে থাকে। তার কাছে মনে হয় জীবনে বেঁচে থাকার কোনো মানে নেই। একদিন তাকে কান্না করতে দেখে ফেলে একজন শিক্ষিকা। তার কাছে জানতে চাইলেও সে কোনো কথাই বলে না।

প্রশ্ন : রিনা কথা বলতে না চাওয়ার কারণ কী?

প্রশ্ন : রিনাকে কীভাবে কথা বলতে উৎসাহিত করা যেতে পারে?

কেস-৩

সুমি ও আফিফা খুব ভালো বন্ধু। দু'জন একই স্কুলে পড়াশোনা করে। তাদের দু'জনের মধ্যে সব কথাই হয়। তাই একে অপরের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অনেক বিষয় জানে। একদিন তাদের মধ্যে কিছু কারণে ভুল বোঝাবুঝি হয় এতে করে তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়। রাগের বশে আফিফা তার অন্য সহপাঠীদের কাছে সুমির ব্যাপারে এমন কিছু তথ্য বলে দেয় যা একান্ত ব্যক্তিগত ছিল এর ফলে অন্যরা তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা শুরু করে। সুমি এতে খুব কষ্ট পায় কারণ উঠতে বসতে তাকে অন্যদের অপমান সহ্য করতে হচ্ছিল। একসময় তার পক্ষে সবকিছু মেনে নিতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। সে ভাবতেও পারেনি তার গোপন কথাগুলো কেউ অন্য কারো কাছে বলে দিতে পারে। সে কাউকেই আর বিশ্বাস করতে পারছিল না।

প্রশ্ন : ঘটনাটি থেকে আপনি কী বুঝতে পারলেন?

প্রশ্ন : এই লেখার মূল শিক্ষণীয় বিষয় কী?

সহমর্মীতা

কেস-১

মুমুর বাবা নেই আজ প্রায় ৬ বছর। খুব ছোটবেলাতেই বাবা মারা যাওয়াতে তার মধ্যে অনেক বিষয় নিয়ে খারাপ লাগা কাজ করে। যখন সে অন্যদের বাবার সাথে দেখে তখন সেই অভাব আরো বেশি অনুভব হয়। একদিন তার স্কুলের গণিত ক্লাসে শিক্ষক পরবর্তী দিন একটি ক্যালকুলেটর ও জ্যামিতি বক্স নিয়ে আসতে বলে। মুমু তার বাসায় জানালেও তার মা আর্থিক অনটনের কথা বলে এবং তার কাছে কিছুদিন সময় চায়। মুমু তার সাথে রাগ করে বলে, তার ভাইকে কোনো কিছু কিনে দিতে দেরি হয় না শুধু তার বেলাতেই এমন কেন হয়। তার মা তাকে বলে যে তার ভাই ছেলে তাই তার রাগ বেশি। তাকে শান্ত রাখার জন্য দ্রুত কিছু দেয়ার চেষ্টা করেন। পরবর্তী দিন স্কুলে গেলে ক্যালকুলেটর এবং জ্যামিতি বক্স না আনার কারণে শিক্ষক তাকে বকাঝকা করেন। এতে করে তার মধ্যে খারাপ লাগা তৈরি হয়। ক্লাসের অন্য ছাত্রীরাও তাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা শুরু করে। এতে করে সে খুব অপমানিত বোধ করে।

প্রশ্ন : মুমুর পাঁচটি অনুভূতির কথা লিখুন।

প্রশ্ন : আপনি কীভাবে মুমুকে সহায়তা করতে পারেন যাতে সে ভালো অনুভব করতে পারেন?

কেস-২

রিনার পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ। খুব কষ্ট করে তাকে পড়াশোনা করতে হয়। তারা ৩ বোন ও ২ ভাই। অনেক সময় বড় বোনের বই, পোশাক ইত্যাদি ব্যবহার করেই তাকে চলতে হয়। তবে এই বিষয়গুলো তার বন্ধুর সাথে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলো হঠাৎ তার পিঠে কিছুটা ভেজা মনে হয় এবং সে দেখে তার পিঠে কালি। তার পাশে দাঁড়ানো সহপাঠী কলম নিয়ে দুষ্টামি করার সময় তার পিঠে কালি ছিটকে পরে। সে এতে খুব রেগে যায়। কিন্তু তার সহপাঠী বলে যে একটা জামা নষ্ট হলে এ নিয়ে এত চিন্তার কী আছে নতুন জামা নিলেই হয়। রিনা তার শ্রেণি শিক্ষিকাকে বিষয়গুলো জানায়। শ্রেণি শিক্ষিকা রিনাকে বলে এসব ছোটখাটো বিষয় নিয়ে ঝগড়া না করে জামা যেন সে ধুয়ে নেয় বা নতুন জামা কিনে নেয়।

প্রশ্ন : রিনার শিক্ষক ও সহপাঠীর আচরণ সম্পর্কে আপনি কী মনে করেন?

প্রশ্ন : রিনার জায়গায় আপনি থাকলে আপনার কী কী অনুভূতি হতো?

কেস-৩

রানী ছাত্রী হিসেবে বরাবরই ভালো। শিক্ষকরাও তাকে খুব পছন্দ করে। কিন্তু দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষায় তার ফলাফল খুব খারাপ হয়েছে। এ নিয়ে শিক্ষকরা তাকে অনেক কিছু বলেছে। পড়ায় মনোযোগ বাড়াতে বললেও ইদানীং তার পক্ষে মনোযোগ দেয়া খুব কষ্টকর হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে ক্লাসেও সে অমোনোযোগী থাকে। এর জন্য তাকে বকাও শুনতে হয়। রানী কাউকেই বলতে পারে না কেন তার এই হঠাৎ বদলে যাওয়া। রানীর বাবা-মা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা বিবাহ বিচ্ছেদ করবে। এসব নিয়ে সংসারের বিভিন্ন সমস্যা প্রতিনিয়ত তাকে ভীষণ কষ্ট দেয়। সব সময় তার মনে বিভিন্ন দুশ্চিন্তা চলতে থাকে। ক্লাসের অন্য ছাত্রীরাও তাকে কটু কথা শোনাতে ছাড়ে না। সবকিছু মিলিয়ে তার মধ্যে অনেক হতাশা তৈরি হয় এবং সে আর স্কুলে যেতে চায় না।

প্রশ্ন : রানীকে সহায়তা করতে প্রথমে কী করা প্রয়োজন?

প্রশ্ন : রানীর এখনকার মানসিক অবস্থায় তার শিক্ষকদের করণীয় কী বলে মনে করেন?

যৌন হয়রানি সম্পর্কিত কেস

কেস-১

মুনিরা (ছদ্মনাম) একটি স্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়ে। সে খুব ভালো ছাত্রী এবং বরাবর ক্লাসে প্রথম/দ্বিতীয় হয়। নিয়মিত স্কুলে আসে। কয়েকদিন ধরে সে লক্ষ্য করছে তার ক্লাসের একজন ছেলে সোহেল (ছদ্মনাম) তাকে সব সময় ফলো করছে, সারাক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তাকে উদ্দেশ্য করে নানা ধরনের আপত্তিকর শারীরিক অঙ্গভঙ্গি করে। একদিন মুনিরা ক্লাসে বসে বই পড়ছিল তখন ক্লাসে কেউ ছিল না এমন সময় সোহেল তার কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে বলে কেমন আছো এবং মুনিরাকে প্রেমের প্রস্তাব দেয়। মুনিরা তাতে রাজি না হলে সোহেল তখন রেগে যায় এবং তাকে হুমকি দিতে থাকে, বলে এই স্কুলে তাকে শান্তিতে পড়তে দেবে না। এরপর থেকে ছেলেটি স্কুলের দেয়ালে, বেঞ্চে এবং বিভিন্ন জায়গায় মেয়েটির নামে নানা আজেবাজে কথা লিখে রাখে, স্কুলে তার নামে বাজে কথা ছড়াতে থাকে। এরফলে স্কুলের অনেকেই মেয়েটিকে দেখলে হাসাহাসি করে, আড়চোখে তাকিয়ে থাকে। ফলে মুনিরা দিনে দিনে মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে, লজ্জায় স্কুলে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। পড়াশোনায় মন বসে না এবং সারাক্ষণ ঘরের কোণায় বসে বসে কান্নাকাটি করে।

১. মুনিরার অনুভূতিগুলোর একটি তালিকা তৈরি করুন।

২. এ অবস্থায় মুনিরার কী করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

৩. আপনি কীভাবে মুনিরাকে সহায়তা করতে পারেন?

কেস-২

খালেদা (ছদ্মনাম) ১০ম শ্রেণির একজন নিয়মিত ছাত্রী। তাদের গ্রামের একজন ছেলে তাকে পছন্দ করত এবং কয়েকদিন আগে বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। খালেদা অল্প বয়সে বিয়ে করতে রাজি হয়নি এ কারণে ছেলেটি তার উপর রেগে যায়। এরপর থেকে সে খালেদার স্কুলের গেইটের সামনে কয়েকজন ছেলেকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তাকে ইঙ্গিত করে প্রতিনিয়ত বাজে মন্তব্য করতে থাকে। তখন খালেদার খারাপ লাগে, খুব অপমান বোধ হয়। একদিন ছেলেগুলো লুকিয়ে ঐ মেয়েটার ছবি তুলে নেয় এবং মেয়েটাকে বলে তার এ ছবিগুলোকে এডিট করে বাজে ছবি বানিয়ে ইন্টারনেটে ছেড়ে দিবে। তার কীভাবে বিয়ে হয় সে দেখে নেবে। এরপর থেকে খালেদার কোনো কিছুই ভালো লাগে না। স্কুলে এসে মনমরা হয়ে বসে থাকে, কারো সাথে তেমন কথা বলে না। এমনকি ক্লাসের কোনো কাজও সে করে না। তার খুব ভয় হয়। একদিন সে হঠাৎ করে স্কুলে আসা বন্ধ করে দেয়। সে কারও সাথে বিষয়টি শেয়ারও করতে পারছে না এবং বাবা-মাকেও বলতে পারছে না কারণ সে তার বাবা-মার সাথে ফ্রি না। সে বুঝতে পারছে না কী করবে।

১. খালেদার ৩টি অনুভূতির তালিকা তৈরি করুন।

২. এ অবস্থায় খালেদার কী করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

৩. আপনি কীভাবে তাকে সহায়তা করতে পারেন?

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও কিশোর-কিশোরীর কেস

কেস-১

সাবিনা ১৪ বছর বয়সের একজন মেয়ে। মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে এসেছে সে। ছোটবেলা থেকেই সে কানে কম শোনে। তার শ্রবণ শক্তি কম হওয়াতে জোরে কিছু না বললে সে কিছু শুনতে পারে না। এ কারণে তাকে অনেক সমস্যায় পড়তে হয়। তার সাথে কেউ খেলতে চায় না। তার শ্রবণ শক্তির সমস্যার কারণে তার সাথে খেলতে গেলে জোরে কথা বলতে হয়। এছাড়াও শ্রবণে সমস্যার কারণে সে কথাও দেরিতে শিখেছে এবং বলতেও সমস্যা হয়। এসব সমস্যার কারণে প্রথমে সে শিশুবান্ধব কেন্দ্রে আসতে আগ্রহী হলেও এখন আর তার আগের মতো আগ্রহ নেই। এখানকার শিশুদের পাশাপাশি শিক্ষকদের সাথেও ওর ভুল বোঝাবুঝি হয়। তার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। মাঝে মাঝে একা একা সে কাঁদে। তার মা বাবা তাকে অনেকভাবে বোঝায় কিন্তু তার কষ্ট তাতে কমে না। পুরো জীবন সে কীভাবে কাটাবে সেটি নিয়ে সে খুবই চিন্তিত।

১. লেখাটি পড়ে সাবিনার ৩টি প্রয়োজন সম্পর্কে লিখুন।

২. লেখাটি থেকে সাবিনার ৩টি অনুভূতি সম্পর্কে লিখুন।

৩. সাবিনার মানসিক অবস্থা ভালো করার জন্য কী ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন হতে পারে?

কেস-২

রিনার বয়স ১২ বছর। ছোটবেলা থেকে তার পায়ে কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু হঠাৎ করে তার পায়ে কিছু সমস্যা দেখা যায়। ধীরে ধীরে তার পা বাঁকা হয়ে যায়। এরপর থেকে সে আর স্বাভাবিকভাবে চলতে পারে না। সে তার সমবয়সি কারো সাথে খেলতে পারে না। অন্য বাচ্চাদের সাথে খেলতে গেলেও তারা খেলতে চায় না, কারণ তারা তাকে তাদের চাইতে দুর্বল মনে করে এবং মনে করে তাদের সাথে খেলায় তাল মেলাতে পারবে না। এক্ষেত্রে প্রায়ই শিক্ষিকাদের হস্তক্ষেপ করতে হয়। সমবয়সিদের কাছে থেকে অনেক কটু কথা শুনতে হয়। আগে যাদের সাথে খেলতো তারা আর খেলতে চায় না। এমনকি তাদের বাবা-মা'ও চায় না তারা খেলুক কারণ তাদের ধারণা ওর উপর জিনের নজর লেগেছে তাই হঠাৎ এমন হয়েছে। তার সাথে কেউ থাকলে তাদেরও এমন হতে পারে। এদিকে তার বাবা-মা'ও তাকে নিয়ে চিন্তিত। তারা চাইছে যত দ্রুত সম্ভব তাকে বিয়ে দিয়ে দিতে। এর জন্য তাদের যা সঞ্চয় আছে তা খরচ করে হলেও বিয়ে দেয়ার জন্য মানুষ খুঁজছে তারা।

১. মনোসামাজিক সহায়তাকারী হিসেবে রিনাকে কী ধরনের সহযোগিতা করা দরকার বলে মনে করেন?

২. লেখাটি থেকে রিনার বর্তমান মানসিক অবস্থা সম্পর্কে বুঝতে পেরেছেন এমন ৩টি বিষয় সম্পর্কে লিখুন।

কেস-৩

রোজিনার বয়স ১৫। ছোটবেলায় অটোরিক্সা দুর্ঘটনায় পা হারায় সে। সেই থেকে ক্রাচে ভর দিয়ে চলতে হয় তাকে। সে পড়াশোনায় ভালো কিন্ত পা না থাকায় বিভিন্ন সমস্যায় পরতে হয় তাকে। তার শ্রেণি কক্ষ দোতলায় হওয়াতে সেখানে উঠতে সমস্যা হয় তার। তাকে সবার আগে আসতে হয়। কারণ দেরিতে আসলে বা গেলে ভিড়ের মধ্যে সে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে বা নামতে পারবে না। একই কারণে সে টিফিনেও ক্লাস থেকে বের হয় না। ক্লাসের অনেকেই তাকে সহযোগিতা করলেও দুই-একজন এমন থাকে যারা তার জীবন বিষিয়ে তোলে। এছাড়াও যেকোনো বিষয়ে তাকে নিয়ে কথা হলে তার পঙ্গুত্ব নিয়ে আগে কথা বলা হয়। তার এই বিষয়গুলো ভালো লাগে না। এখন সে ৯ম শ্রেণিতে পড়ে। আর অল্প কিছুদিন পরেই সে ১০ম শ্রেণিতে পড়তে শুরু করবে। বাসায় চাপা গুঞ্জন শুনতে পায় এরপর আর তাকে পড়ানোর ইচ্ছা নেই বাবা-মায়ের। একে তার পঙ্গুত্ব তার উপর বেশি পড়াশোনা করে বয়স বেশি হয়ে গেলে বিয়ে দিতে পারবে না। এ নিয়ে তার মধ্যে খারাপ লাগা কাজ করে, নিজে নিজে খুব কষ্ট পাচ্ছে সে। কার সাথে কথা বলবে তা বুঝতে পারছে না, পড়ালেখায় মনোযোগ কমে যাওয়াতে ফলাফল ক্রমাগত খারাপ হচ্ছে।

১. রোজিনার শারীরিক সমস্যার প্রভাবে হচ্ছে এমন ৩টি মানসিক সমস্যা লিখুন।

২. রোজিনার মানসিক সমস্যার সমাধানে করণীয় ৩টি কাজ লিখুন।

স্বদেশ-প্রেমের কেস

নাতাশা একজন ১৩ বছর বয়সি কিশোরী। সে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। সে খুবই যুগোপযোগী সৌন্দর্য সচেতন ও ফ্যাশন প্রিয়। কিন্তু কিছুদিন ধরে সে খুবই বিরক্ত, তার কোনো কিছুই ভালো লাগছে না। তার শুধু মনে হচ্ছে চারপাশে অনেক নোংরা, যেদিকে তাকায় শুধু মানুষ আর মানুষ, আর মানুষগুলো যেন কেমন কেমন। দেশের মানুষের কোনো নিয়মশৃঙ্খলা নেই, সময়জ্ঞান নেই, সবাই কেমন যেন ঘোরের মধ্যে আছে, পরিকল্পনা ছাড়াই ছুটছে। দেশে তৈরি প্রতিটা পণ্য অত্যন্ত নিম্নমানের, ব্যবহার উপযোগী নয়। দেশের ভিতর কোথাও যে ঘুরতে যাবে এমন জায়গাও সে খুঁজেই পায় না। ওগুলো বেড়ানোর জায়গা নাকি! নোংরা, মানুষের ভিড় আর ঠেলাঠেলি। তার শুধু মনে হয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশ কত সুন্দর, কত সাজানো-গোছানো, কত উন্নত, কত আধুনিক! সে সব দেশের মানুষ কত সময়ানুবর্তী ও কত নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন করে! সে সব দেশের সকল পণ্য মানসম্মত, সেগুলো ব্যবহার করার ভালোলাগাই অন্যরকম। তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, রীতিনীতি কত তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যান্য দেশ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, খেলাধুলা, মহাকাশ গবেষণায় কতটা এগিয়ে! আর বাংলাদেশ সব দিক দিয়ে কতটা পিছিয়ে! কিছুই নেই এদেশে। শুধুশুধুই সে এদেশে পরে আছে। এখানকার সব কিছুই তার অসহ্য লাগছে। নিজেকে এই দেশের নাগরিক হিসেবে পরিচয় দিতে তার লজ্জা লাগে। সে চায় যতটা দ্রুত সম্ভব এই দেশ ছেড়ে চলে যেতে। সে আর এক মুহূর্তও এদেশে থাকতে চায় না। এই অবস্থায় নাতাশা মনোসামাজিক সহায়তাকারীর কাছে সাহায্যের জন্য এসেছে।

প্রশ্ন : মনোসামাজিক সহায়তাকারী হিসেবে আপনি কীভাবে নাতাশাকে সহায়তা করবেন?

জরুরি পরিস্থিতিতে সৃষ্ট কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য সংকটসমূহ এবং এর ব্যবস্থাপনা

কৈশোরকাল (১০-১৯ বছর) জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সময়ে কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক, মানসিক ও আচরণগত পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনের ফলে তারা বিভিন্ন জটিলতার সম্মুখীন হতে পারে। বিশ্বব্যাপী আনুমানিক ১০-২০% কিশোর-কিশোরী বিভিন্ন ধরনের মানসিক সমস্যায় ভোগেন (WHO, 2019)। বাংলাদেশে এই হার ১৩.৪ থেকে ২৯.৯ শতাংশ (Hossain et al., 2014)। একাধিক শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক পরিবর্তনসহ দারিদ্রতা, যেকোনো ধরনের হয়রানি বা সহিংসতা, প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়া, অর্থনৈতিক অবস্থা, মাদকদ্রব্যের ব্যবহার, বিবাহ, সন্তান জন্মদান, স্কুলে খারাপ ফলাফল ইত্যাদি কারণে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে নানা ধরনের মানসিক সমস্যা যেমন উদ্বেগ, হতাশা, বিষণ্ণতা, বিরক্তি, রাগ, একাকীত্ব, প্রত্যাহারমূলক মনোভাব, মনোযোগের সমস্যা, আত্মহত্যা প্রবণতা, সোমাটোফর্ম ব্যাধি, স্কুল প্রত্যাখ্যান, কনভার্শন সামগ্রিকভাবে আরও অন্যান্য মানসিক সমস্যা দেখা যায় (WHO, 2019; Mullick MSI & Nahar JS et al., 2019; BRAC and Population Council, 2015)।

বর্তমানে কোভিড -১৯ মহামারীর কারণে পুরো পৃথিবী একটি কঠিন সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। ইউরোপ-আমেরিকা থেকে শুরু করে এশিয়ার প্রত্যেকটি দেশের মতো বাংলাদেশেও এই ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। বিশ্বজুড়ে এবং বাংলাদেশেও আক্রান্তের ও মৃতের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। অনেক গবেষণায় দেখা গিয়েছে এই অদৃশ্য কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষত শিশু এবং কিশোর-কিশোরীরা নানা ধরনের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছে (Anagnostopoulos D., ESCAP, 2020)। কোভিড-১৯ এর সাথে, পারিবারিক সহিংসতা এবং শিশু যৌন নির্যাতনের ঝুঁকি বেড়েছে। পারিবারিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে, এর বেশিরভাগ অংশ পরিবারের সদস্যদের হাতে ঘটে যারা নারী, কিশোর-কিশোরী এবং শিশুদের উপর লাঞ্ছনা ও নির্যাতন করে থাকে। যেহেতু বর্তমানে নির্যাতনকারীরা প্রতিনিয়ত বাড়িতে উপস্থিত থাকছে সুতরাং নির্যাতনের মাত্রা আরো বেড়ে গিয়েছে। ৮০% কিশোর-কিশোরী নির্যাতনের শিকার হচ্ছে (WHO, 2020; Mizan A.S., 2020; IOM, 2020; UNHCR, 2020; Save the Children, 2020; Population Council, 2020)

এই পরিস্থিতিতে স্কুল কলেজ বন্ধ থাকায় সবাইকে বাসায় থাকতে হচ্ছে, বন্ধুবান্ধব, শিক্ষক, আত্মীয়-স্বজন, কমিউনিটি থেকে দূরে থাকতে হচ্ছে, আইসোলেশন, কোয়ারেন্টাইন, বাবা-মার মানসিক অবস্থা, নিজের ও আপনজনের কারো আক্রান্ত হয়ে যাওয়া, চারপাশে উদ্বেগজনক খবর, পারিবারিক কলহ ও নির্যাতন, বৈশ্বিক আর্থ-সামাজিক সংকটের ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদি কারণে বিভিন্ন ধরনের মানসিক অসুবিধা দেখা যাচ্ছে। যেমন :

- নিজের এবং আপনজনের আক্রান্ত হয়ে যাওয়ার ভয়
- যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা নিয়ে দুশ্চিন্তা
- যাদেরকে হারিয়েছেন তাদের জন্য কষ্ট
- বন্ধুদের মিস করা এবং বাহিরে না যেতে পারার জন্য খারাপ লাগা
- এই সংকট কত দিন থাকবে এ সম্পর্কিত ভয় থেকে শুরু করে মহামারীটির সম্ভাব্য অর্থনৈতিক পরিণতি সম্পর্কে ভয় ও উদ্বেগ এবং ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা নিয়েও ভয়
- উদ্বিগ্নতা, একাকীত্ব, বিষণ্ণতা, রাগ, বিরক্তি, খিটখিটে মেজাজ, অস্থিরতা
- প্রত্যাহারমূলক আচরণ, মাদক দ্রব্যের ব্যবহার, আত্মহত্যামূলক মনোভাব
- ট্রমা, দুর্ঘটনা পরবর্তী মানসিক বৈকল্য (PTSD), অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিজঅর্ডার (OCD) ইত্যাদি (WHO, 2020; UNFPA, 2020; D. Anagnostopoulos, ESCAP, 2020; U.S department of health and human service, 2020; Iodes, M., 2020).

কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করা এবং প্রতিকূল অভিজ্ঞতা ও ঝুঁকিপূর্ণ কারণগুলো থেকে রক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এগুলো তাদের সুস্থতার জন্য এবং যৌবনে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। তাছাড়া যেকোনো সংকটময় পরিস্থিতি মানসিক স্বাস্থ্যের উপর যে প্রভাব ফেলে সেই প্রভাব পরবর্তীতে দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে বিশেষ করে শরণার্থী এবং অভিবাসী শিশুদের ক্ষেত্রে (Merrilees C. et al., 2017 and Masten & Narayan, 2012)। তাই এ পরিস্থিতিতেতে মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে হলে শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে হবে। নিম্নোক্ত উপায়গুলোর মাধ্যমে কিশোর-কিশোরী তাদের মানসিক স্বাস্থের যত্ন নিতে পারে।

- নিজের অনুভূতির পাশাপাশি শারীরিক, মানসিক, আচরণগত প্রতিক্রিয়ার প্রতি মনোযোগ দেওয়া এবং বোঝা। অনুভূতিকে গ্রহণ করা এবং সম্মান করা। নিজেকে বলা যেতে পারে, এ ধরনের পরিস্থিতিতে এমন অনুভূতি হতেই পারে
- যে পরিস্থিতি বা ঘটনা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে তা মেনে নেওয়া
- সম্ভব হলে বিশ্বস্ত কারো সাথে মনের কথা শেয়ার করা, শেয়ার করা সম্ভব না হলে লেখে ফেলা
- পরিবার, আপনজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধবদের সাথে মোবাইলে কথা বলার মাধমে বা প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধমে যোগাযোগ বজায় রাখা
- সম্ভব হলে পরিবারের মানুষের সাথে অর্থপূর্ণ ও সুন্দর সময় কাটানো
- শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করা (নাক দিয়ে লম্বা করে শ্বাস নিয়ে কিছুক্ষণ আটকে রেখে তারপর সময় নিয়ে মুখ দিয়ে হা করে ধীরে ধীরে শ্বাস ছেড়ে দেওয়া)। এতে অতীত-ভবিষ্যতের চেয়ে বর্তমানের প্রতি মনোযোগ বাড়বে। শরীর ও মন প্রশান্ত হবে এবং ফুসফুসের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে
- শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী নানা ধরনের শরীর চর্চা বা ব্যায়াম করা যেতে পারে
- সময়মতো সবকিছু করা (খাবার গ্রহণ, পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমানো, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ইত্যাদি)
- করোনা পরিস্থিতি সম্পর্কিত সংবাদ দেখা, পড়া বা শোনা কমিয়ে দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেখার চেষ্টা করা এবং কেবল বিশ্বস্ত উৎস থেকে তথ্য অনুসন্ধান করা
- নিজের ভালোলাগার কাজ করা সেটা হতে পারে- বই পড়া, গাছের যত্ন নেয়া, ছবি আঁকা, ধর্মীয় কাজ করা এবং যে কাজগুলো করলে ভালো বোধ হয়, প্রশান্তি অনুভব হয় তা করা
- সৃজনশীল বিভিন্ন কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখা যেমন : পেইন্টিং করা, ঘরে থাকা পুরনো জিনিস দিয়ে নতুন কিছু তৈরি করা ইত্যাদি
- নিজেকে ভালো রাখার জন্য যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়েছে বা অন্য যেকোনো কাজ সেটা যত ছোটই হোক না কেন এর জন্য নিজেকে প্রশংসা করা এবং ধন্যবাদ দেওয়া
- প্রয়োজনে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা দানকারী সংস্থাগুলো থেকে অনলাইন ভিত্তিক মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নেয়া

শরণার্থী ও অভিবাসী কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য সঙ্কটসমূহ এবং এর ব্যবস্থাপনা

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যেকোনো ধরনের হিউম্যানিটেরিয়ান জরুরি অবস্থা কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ করে শরণার্থী এবং অভিবাসী কিশোর-কিশোরী, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু, এতিম এবং সংখ্যালঘু জাতি বা অন্যান্য বৈষম্যমূলক গোষ্ঠীর এবং দুর্যোগ (বন্যা, ঘূর্ণিঝড়) থেকে বেঁচে যাওয়া কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশি শরণার্থী শিশুদের মধ্যে ৫২% শিশু (২-১৬) নানা ধরনের মানসিক অসুবিধায় ভুগছে। এই ধরনের জরুরি অবস্থায় কিশোর-কিশোরীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানা ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যায় যেমন সংঘর্ষ, প্রিয়জনকে হারানো, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, অধিকার হারানো, বৈষম্যের শিকার, সম্পত্তি হারানো, যৌন হয়রানি, পাচার, আটক, যৌন-লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা (GBV), শিক্ষার অভাব, বেকারত্ব, দরিদ্রতা, অপূর্ণ মৌলিক চাহিদা, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা ইত্যাদি কারণে তারা মানসিক চাপ, ট্রমা, দুর্ঘটনা পরবর্তী মানসিক বৈকল্য (PTSD), উদ্বিগ্নতা, বিষণ্ণতা, মেজাজের বিকৃতি, হতাশা, ব্যক্তিত্বজনিত ব্যাধি, আগ্রাসী মনোভাব, আত্মহত্যার প্রবণতা, মাদকদ্রব্যের ব্যবহার ইত্যাদি মানসিক সমস্যায় ভোগে (WHO, 2016; loades M., 2020; Hodes, et al., 2008; Alderman K. et al., 2012; Khan N.J. & Ahmed M.U. et al., 2019)

বর্তমান পরিস্থিতিতে শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে দিন দিন কোভিড-১৯ সংক্রমণের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। অন্যান্য কিশোর-কিশোরীদের মতো শরণার্থী ও অভিবাসী কিশোর-কিশোরীরাও একই ধরনের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। আমরা জানি এ ধরনের কিশোর-কিশোরীরা এমনিতেই এক ধরনের সংকটময় জীবন যাপন করছে এই পরিস্থিতির ফলে তাদের মধ্যে আরো বেশি উদ্বেগ, বিষণ্ণতা, দুর্ঘটনা পরবর্তী মানসিক বৈকল্য (PTSD), অনিশ্চয়তা, ভয় ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে (U.S department of health and human service, 2020; lodes M., 2020)। কোভিড-১৯-এর কারণে ক্যাম্প লকডাউন থাকার ফলে কমিউনিটি সেন্টার, শিশু ও কিশোর-কিশোরী বান্ধব কেন্দ্র, খেলার জায়গা, শিক্ষা কেন্দ্র বন্ধ আছে এতে কিশোর-কিশোরীদের স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবনযাপন ব্যাহত হচ্ছে।

একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, উদ্বেগজনক খবর, আর্থ-সামাজিক সঙ্কট, মৌলিক চাহিদার অভাব, পূর্ব বিদ্যমান অবস্থার বর্ধন, গুজব, শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, বেকারত্ব, লকডাউন এর কারণে পর্যাপ্ত সহায়তা ও সেবার অভাব, উপকরণের (সাবান, হ্যান্ডওয়াশ) অভাবে পরিচ্ছন্নতা রক্ষার অক্ষমতা, ঘনবসতিপূর্ণ বাসস্থানে সামাজিক ও শারীরিক দূরত্ব মেনে চলার অসুবিধা, প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কে সঠিক তথ্যের অভাব ইত্যাদি কারণে ভাইরাস ছড়ানোর ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে এবং ৬২% কিশোর-কিশোরীদের নানা ধরনের মানসিক সমস্যা দেখা যাচ্ছে যেমন : উদ্বেগ, বিষণ্ণতা, আক্রান্ত হওয়া ও মরে যাওয়ার এবং আপনজনকে হারানোর ভয়, মানসিক অবসন্নতা, বিরক্তি, একাকীত্ব, অনিশ্চয়তা, অসহায়ত্ব, নিরাপত্তাহীনতা, সম্পর্কের অবনতি, রাগ, হতাশা, মাদক ব্যবহার, আত্মহত্যার প্রবণতা, মেজাজের বিকৃতি, মানসিক চাপ ইত্যাদি। তাছাড়া যৌন হয়রানি, শোষণ, নির্যাতন, যৌন-লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা (GBV), কিশোর অপরাধ, বাল্যবিবাহ, পাচার হওয়ার সম্ভাবনা ইত্যাদি বেড়ে যাচ্ছে। ক্যাম্প লকডাউন থাকার ফলে নির্যাতনকারী ও তাদেরকে একসাথে দীর্ঘক্ষণ থাকতে হচ্ছে এতে নির্যাতিত হওয়ার সম্ভাবনা এবং তাদের মানসিক চাপ, ভয়, উদ্বেগ আরো বেড়ে যাচ্ছে। (WHO, 2020; UNFPA, 2020; IOM, 2020; Eaton J. CBM, UNICEF, 2020; Mullick MSI, 2020; UNHCR, 2020; Save the Children,2020; Asad K.M. Educo, 2020; Shishir N.N., 2020)

এ সময় মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া খুবই জরুরি। নিম্নোক্ত উপায়ে মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া যেতে পারে :

- এ পরিস্থিতিতে নিজের অনুভূতিকে একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করা। অনুভূতির পাশাপাশি শারীরিক, মানসিক, আচরণগত প্রতিক্রিয়ার প্রতি মনোযোগ দেওয়া এবং বোঝা।
- যে পরিস্থিতি বা ঘটনা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে কষ্ট হলেও তা মেনে নেওয়া
- ইতিবাচক চিন্তা করা যেমন : এ ধরনের পরিস্থিতিতে এমন অনুভূতি হওয়া স্বাভাবিক যা পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক করছে এবং নিজের সুরক্ষার জন্য ব্যবস্থা নিতে সহায়তা করছে। আমি একাই নই এবং আক্রান্ত রোগীর একটা বড় অংশ সুস্থ হয়ে উঠছে
- সম্ভব হলে বিশ্বস্ত কারো সাথে মনের কথা শেয়ার করা
- অন্যান্যদের সাথে সংযোগের জন্য বিকল্প উপায় অনুসন্ধান করা এবং সম্ভব হলে পরিবারের মানুষের সাথে গুণগত ও সুন্দর সময় কাটানো
- শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করা (নাক দিয়ে লম্বা করে দীর্ঘ সময় ধরে শ্বাস নিয়ে কিছুক্ষণ আটকে রেখে তারপর সময় নিয়ে মুখ দিয়ে হা করে ধীরে ধীরে ছেড়ে দেওয়া)
- সময়মতো সবকিছু করা (খাবার গ্রহণ, পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমানো, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ইত্যাদি)
- শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী ঘরে করা যায় এমন শরীর চর্চা বা ব্যায়াম করা যেতে পারে
- করোনা পরিস্থিতি সম্পর্কিত সংবাদ শোনা বা আলাপ কমিয়ে দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে শোনার চেষ্টা করা এবং কেবল বিশ্বস্ত উৎসের তথ্য বিশ্বাস করা
- নিজের ভালোলাগার কাজ করা সেটা হতে পারে- হাতের কাজ করা, সেলাই করা, ঘরে থাকা পুরনো জিনিস দিয়ে নতুন কিছু তৈরি কর, ধর্মীয় কাজ করা এমনভাবে যে কাজগুলো করলে ভালো বোধ হয়, প্রশান্তি অনুভব হয় তা করা
- আত্মবিশ্বাসের সাথে "না" বলতে শেখা
- স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা এবং অন্যান্য কী কী সেবা ও সহায়তা প্রচলিত আছে সে সম্পর্কে অবহিত থাকা এবং প্রয়োজনে সেবা নেওয়া

বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে বন্যা খুবই উল্লেখযোগ্য একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এই সময়ে মানুষের অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি অন্যান্য যে ক্ষতি হয় তা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অনেক সময় এই প্রভাব দীর্ঘ মেয়াদি হতে পারে। বন্যায় বাড়ি-ঘর হারানো, পরিবার হারানো, প্রিয় পোষা প্রাণী হারানো, আপনজনের মৃত্যু, টেলিভিশন ও মিডিয়ার খবর, ফসল নষ্ট হওয়া, সম্পত্তি হারানো, খাদ্যের অনিশ্চয়তা, শিক্ষার অভাব, পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ঘাটতি, পর্যাপ্ত সেবার অভাব, যথাযথ তথ্যের অভাব ইত্যাদির কারণে এই সময়ে হতবাক, নির্বোধ এবং শক্তিহীন অনুভূতি, উদ্বেগ, বিষণ্নতা, দুর্ঘটনা পরবর্তী মানসিক বৈকল্য (PTSD), ভয়, বিরক্তি, একাকীত্ব, অপরাধবোধ, দুঃখ, কষ্ট, মনোযোগের অসুবিধা, রাগ, আত্মহত্যার প্রবণতা, মাদকদ্রব্যের ব্যবহার, তীব্র মানসিক চাপ, অসহায়ত্ব, আশাহীনতা, ধ্বংসাত্মক মনোভাব, নানা স্বাস্থ্য সমস্যা, সাইকোটিক সমস্যা যেমন স্কিজোফ্রেনিয়া, বাইপোলার ডিজঅর্ডার, নিউরোটিক ডিজঅর্ডার ইত্যাদি নানা ধরনের মানসিক অসুবিধা দেখা যায়। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের মানসিক অবস্থা আরো বেশি হুমকির মধ্যে রয়েছে। (Alderman K et al., 2012; Health protection agency, 2010; The American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2015; Jahan S .,2015; Farnandez et al,2015; Hossain B.,2020; WHO, 2020)।

দুর্যোগের সময় সৃষ্ট মানসিক চাপ সঠিকভাবে মোকাবেলা না করা হলে এটি মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে। এই কঠিন সময়ে মানসিক চাপ মোকাবিলা করার জন্য কিছু ব্যবস্থাপনা হলো :

- এ পরিস্থিতিতে নিজের অনুভূতিকে একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করা। অনুভূতির পাশাপাশি শারীরিক, মানসিক, আচরণগত প্রতিক্রিয়ার প্রতি মনোযোগ দেওয়া এবং বোঝা
- যে পরিস্থিতি বা ঘটনা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে কষ্ট হলেও তা মেনে নেওয়া
- সম্ভব হলে বিশ্বস্ত কারো সাথে মনের কথা শেয়ার করা
- নিজের প্রতি যত্ন নেওয়া যেমন- বিশ্রাম করা, ঠিক সময়ে খাওয়া, ঘুমানো, শরীর চর্চা বা ব্যায়াম করা ইত্যাদি
- দুর্যোগ সম্পর্কিত সংবাদ দেখা, পড়া বা শোনা কমিয়ে দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেখার চেষ্টা করা এবং তথ্যের সত্যতা যাচাই করা
- নিজেকে ভালো রাখার জন্য নিজের পছন্দনীয় এবং উপভোগ্য কাজগুলো করা যেমন- পছন্দের বই পড়া, গান শোনা, খেলাধুলা করা এমনভাবে যে কাজগুলো করলে ভালো বোধ হয়, প্রশান্তি অনুভব হয় তা করা
- আত্মবিশ্বাসের সাথে "না" বলতে শেখা
- শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করা (নাক দিয়ে লম্বা করে দীর্ঘ সময় ধরে শ্বাস নিয়ে কিছুক্ষণ আটকে রেখে তারপর সময় নিয়ে মুখ দিয়ে হা করে ধীরে ধীরে ছেড়ে দেওয়া)
- আশা রাখা যে আমার অতীত অভিজ্ঞতা, আমার দক্ষতা, আমার সম্ভাবনা সব কাজে লাগিয়ে অবশ্যই আমি এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারব
- কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যেমন : এই যে বেঁচে আছেন, নিঃশ্বাস নিতে পাচ্ছেন, আপনার যা আছে, আপনি যেমনি আছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা
- স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা এবং অন্যান্য কী কী সেবা ও সহায়তা প্রচলিত আছে সে সম্পর্কে অবহিত থাকা এবং প্রয়োজনে সেবা নেওয়া

বর্তমান এ সংকটময় সময়ে কিশোর-কিশোরীদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ সময়ে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচর্যার পাশাপাশি সঠিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকা সম্ভব।

References

- *Dr. M. Loades, "Rapid Systematic Review: The impact of social isolation and loneliness on the mental health of children and adolescents in the context of COVID-19'," *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, *o2 June, 2020.*
- *Alderman K, Turner LR, Tong S. Floods and human health: a systematic review. Environ Int. 2012; 47:37–47. pmid:22750033*
- *Mullick MSI, Algin S, Islam M, Phillipson A, Nahar JS, Morshed NM, Chowdhury HR, Shahid SFB. Dhaka stress scale- adolescent: A scale for assessing psychosocial stressors among adolescents. Bangabandhu Sheikh Mujib Med Univ J. 2019; 12: 167-176.*
- *Anagnostopoulos D., Communications of the European Society for Child and Adolescent Psychiatry Eur Child Adolesc Psychiatry (2018) 27:253–257 https://doi.org/10.1007/s00787-017-1064-1*
- *Coronavirus Disease (COVID-19) Preparedness and Response - UNFPA Technical Briefs V March 24_2020*
- *https://www.bpfbd.org/wp-content/uploads/2019/07/54.-Outreach_Khan_et_al-2019-Rohingya-Children_CCHD.pdf*
- *https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health*
- *file:///E:/official%20task%202020/Adolescent%20mental%20health,%202020/Dowloded%20file/mental-health-considerations.pdf*
- *file:///E:/official%20task%202020/Adolescent%20mental%20health,%202020/Dowloded%20file/National-Strategy-for-Adolescent-Health-2017-2030-Final-Full-Book-21-06-17.pdf*
- *file:///E:/official%20task%202020/Adolescent%20mental%20health,%202020/Dowloded%20file/guide_facilitators_slideshow(1).pdf*
- *https://www.unhcr.org/health-covid-19.html*
- *https://www.savethechildren.net/news/covid-19-forty-percent-rohingya-refugee-children-bangladesh-are-scared-dying-or-losing-loved*
- *http://cretscmhd.psych.ucla.edu/nola/Video/MHR/Governmentreports/Psychosocial%20Issues%20for%20Children%20and%20Adolescents%20in%20Disasters.pdf*
- *The Daily Star, June 27, 2020 available at: https://www.thedailystar.net/opinion/human-rights/news/domestic-violence-during-the-time-corona-1888192)*
- *https://reliefweb.int/report/bangladesh/essential-protection-services-rohingya-camps-during-covid-19-lockdown*
- *https://www.thethirdpole.net/2020/04/02/rohingya-camps-in-bangladesh-vulnerable-to-devastating-covid-19-outbreak/*
- *https://internationalmedicalcorps.org/wp-content/uploads/2017/07/Mental-Health-and-Psychosocial-Support-Considerations-for-Syrian-Refugees-in-Turkey.pdf*

রেফারেল

মনোসামাজিক সহায়তা কেন্দ্রসমূহ

ব্র্যাক শিক্ষা উন্নয়ন ইন্সটিটিউট, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় (BIED, BRAC University)

সময় : রবি-বৃহস্পতি, ৯:০০-৫:০০ টা
সেবাগ্রহীতা : শিশু, কিশোর-কিশোরী, ও প্রাপ্তবয়স্ক
সেবার ধরন : একক, দলীয়, পারিবারিক, যুগল কাউন্সেলিং
স্থান : বাড়ি নং ১১৩, রোড নং ২, ব্লক-এ, নিকেতন হাউজিং সোসাইটি, গুলশান ১, ঢাকা ১২১২
যোগাযোগ : ০১৭৬৭৩৭১০৬২

এডুকেশনাল অ্যান্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠান : এডুকেশনাল অ্যান্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগ, ঢাকা
সময় : শনি-বৃহস্পতি, ৯.০০-৫.০০ টা
সেবাগ্রহীতা : শিশু ও বয়স্ক
সেবার ধরন : কাউন্সেলিং
স্থান : কলাভবন, ৫ম তলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
যোগাযোগ : ০১৯৬৭৮৬৭৯৩৩
ফি : শিশু- ৮০০ টাকা, বয়স্ক- ৬০০ টাকা

নাসিরুল্লাহ সাইকথেরাপি ইউনিট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সময় : শনি- বৃহস্পতি (শুক্রবার ও সরকারি ছুটি বাদে), ১০.০০-৬.০০ টা
সেবাগ্রহীতা : শিশু ও বয়স্ক
সেবার ধরন : সাইকোলজিক্যাল থেরাপি ও কাউন্সেলিং
স্থান : কলাভবন, থার্ড ফ্লোর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
যোগাযোগ : ০১৭৫৫৬৫৪৮৩৫
ফি : একক সেশন- ৩০০ টাকা, গ্রুপ সেশন- ১৫০ টাকা

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

সময় : শনি-বৃহস্পতি, ৮.০০-২.০০ টা
সেবাগ্রহীতা : শিশু থেকে বয়স্ক
সেবার ধরন : সাইকোথেরাপি,কাউন্সেলিং
স্থান : বকশি বাজার, রমনা, ঢাকা- ১০০০, কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের পাশে
ফি : বহির্বিভাগে ১০ টাকার টিকিট কাটতে হয়

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট এবং হাসপাতাল

সময় : ৮.৩০-২.০০ টা
সেবাগ্রহীতা : মানসিক রোগী
সেবার ধরন : মানসিক রোগ চিকিৎসা এবং কাউন্সেলিং সেবা (বহির্বিভাগ : ১০ টাকা টিকেট)
স্থান : শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
ফোন : ০২৯১১১৩৬২,০২৯১১৮১৭১, মোবাইল : +৮৮-০১৭৩০৩৩৩৭৮৯

জাতীয় ট্রমা সেন্টার

সেবাগ্রহীতা- প্রাপ্ত বয়স্ক
সেবার ধরন- কাউন্সেলিং
স্থান : ২২/৮, ব্লক-বি, মিরপুর রোড, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
টেলিফোন : ৮১১৬৯৬৯, ৮১৩০৫০৮, ৯১৪৬৫৪৩
ইমেইল : info@traumacenter.com.bd

মানসিক হাসপাতাল, পাবনা

সব ধরনের মানসিক রোগীদের এবং মাদকাসক্তদের (পুরুষ) সেবা দেয়া হয়।
বয়স সীমা : ১৮-৫০ বছর
সময় : ৮ টা থেকে ২.৫০ টা পর্যন্ত
ফোন : ০১৭৩১৬৬৩২১, ফ্যাক্স : ৬৫৫৮১

ছাত্র নির্দেশনা ও পরামর্শকেন্দ্র (টিএসসি)

সময় : শনি-বৃহস্পতি, ৯.০০-৫.০০টা
সেবাগ্রহীতা : শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য
সেবার ধরন : কাউন্সেলিং
স্থান : টি.এস.সি, ২য় তলা, ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়
যোগাযোগ : ৯৬৬১৯২০-৭৩, এক্সটেনশন : ৪২০৩;
ফি : ফ্রি সেবা

কাউন্সেলিং অ্যান্ড গাইডেন্স সেন্টার , ঢাকা কলেজ

মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা
সময় : সোম ও মঙ্গল, ১২.০০-২.০০টা
সেবাগ্রহীতা : ঢাকা কলেজের ছাত্র ও কলেজ স্টাফ
সেবার ধরন : কাউন্সেলিং
স্থান : ঢাকা কলেজের মূল ভবন
যোগাযোগ : ০১৯১৩৬১৫৫৭৬
ফি : ফ্রি সেবা

সাজেদা ফাউন্ডেশন

ফোন : ৯৮৯০৫১৩, ৯৮৫১৫১১ ext. ১৬২, ১৬৩, ১৬৪
মোবাইল : ০১৯৪২৬৫৭২৩৬, ০১৭২০৯০৮৩৮৩, ০১৯৭৯৯৩০০০৬, ফ্যাক্স : ৯৮৬৩১৬৫E
ই-মেইল : sajida@sajidafoundation.org

আইন ও সালিশ কেন্দ্র

সময় : রবি-বৃহস্পতি ৯.০০-৫.০০টা
সেবাগ্রহীতা- নিপীড়িত ও অসহায় জনগোষ্ঠীকে আইনি সহায়তা
সেবার ধরন- আইনি সহায়তা, শিশু সহায়তা, মনোসামাজিক কাউন্সেলিং
স্থান : ৭/১৭, ব্লক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭
যোগাযোগ : ০২৮১২৬১৩৭, ০২৮১২৬০৪৭, ০২৮১২৬১৩৪, ০১৭২৪৪১৫৬৭৭, ০১৭৫৭১১২৬
ফি : দরিদ্রদের জন্য ফ্রি

Child Helpline: ১০৯৮

স্থান : ১৪/৩/A, স্বর্ণালি গার্ডেন, বাইশটেকি (BRTA মেইন গেট-এর বিপরীত পাশে), মিরপুর-১৩, ঢাকা-১২১৬
ফোন : ৯০২৯৫৫৬, ৯০২১২৬২, ৯০২১২৬৩

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ), শাহবাগ, ঢাকা

সময় : শনি-বৃহস্পতি (সকাল ৮.০০-দুপুর ২.০০)
সেবাগ্রহীতা : শিশু থেকে বয়স্ক
সেবার ধরন : সাইকোথেরাপি, কাউন্সেলিং
ফি : বহির্বিভাগে ১০ টাকার টিকিট কাটতে হয়

আইসিডিডিআর,বি (ICDDR,B)

সময় : রবি-বৃহস্পতি(সকাল ৮.৩০-বিকাল ৫টা)
সেবার ধরন : এইচ.আইভি টেস্টিং এবং এইচ.আইভি রোগীদের কাউন্সেলিং
৬৮, শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণী, মহাখালী, ঢাকা
ফোন : ৮৮৬০৫২৩-৩২

ওসিসি (ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার)

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের পাশে
সেবাগ্রহীতা : নির্যাতিত নারী ও শিশুরা
সেবা নেয়ার জন্য প্রথমে ভর্তি হতে হবে। হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পাওয়ার পরবর্তী সময়ে ভর্তির কাগজ দেখিয়ে সেবা নেয়া যাবে।
সেবার ধরন : কাউন্সেলিং ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা
ফোন নম্বর : ০১৭১৩৪২৩৪৯০, ৯৬৬৪৬৯৯

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

সেবার ধরন : আইনি সহায়তা
সেবাগ্রহীতা : নির্যাতিত নারী, পুরুষ ও শিশুরা
স্থান : গুলফেসান প্লাজা, ফ্লোর-১১, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৮৮-০২-৮৩৩১৪৯২
ই-মেইল : nhrc.bd@gmail.com

মহিলা সহায়তা কেন্দ্র

স্থান : ৩৭/৩, ইস্কাটন গার্ডেন রোড
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা
ফোন : ৯৩৫০৩৯১

বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা

দরিদ্র এবং ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করে
স্থান : ৪, কলেজ রোড, ঢাকা -১০০০
ফ্যাক্স : ৯৫১৩৮৩৬
ইমেইল : info@manabadhikar.org

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি (BNWLA)

সেবার ধরন : আইনি সেবা
স্থান : মনিকা টাওয়ার, ৪৮/৩, পশ্চিম আগারগাঁও, ঢাকা- ১২০৭, বিজ্ঞান জাদুঘরের বিপরীতে
ফোন : ৮১২৩০৬০, ৮১১২৮৫৮, ০১৭১১৮০০৪০০, ০১৭১১৮০০৪০১, ০১৭১১৫৭১৬৫৩
ইমেইল : bnwla@bdonline.com

বাংলাদেশ মানবাধিকার সংস্থা

৭২, জিগাতলা রোড (আয়েশা একাডেমীর পাশের গলি) ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৭
ফোন : ৮৬১০৮৯১

কান পেতে রই

সেবার ধরন : ফোন হেল্পলাইন
সময় : রবি-বুধবার, বিকাল ৩টা-রাত ৯টা, বৃহস্পতিবার- রাত ৯টা- ভোর ৩টা
ফোন : ০১৭৭৯৫৫৪৩৯১, ০১৭৭৯৫৫৪৩৯২, ০১৬৮৮৭০৯৯৬৫, ০১৬৮৮৭০৯৯৬৬, ০১৯৮৫২৭৫২৮৬, ০১৮৫২০৩৫৬৩৪
ওয়েবসাইট : http://www.shuni.org, https://www.facebook.com/kaan.pete.roi

নারীদের জন্য

ডেভলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ ফর এডভান্সমেন্ট (দিশা)

প্রতিষ্ঠান : ডেভলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ ফর এডভান্সমেন্ট (দিশা)
সময় : ৯.০০-৫.০০ টা, শুক্রবার বন্ধ।
সেবাগ্রহীতা : শিশু, মহিলা (স্কুল ও কমিউনিটি)
সেবার ধরন : চাইল্ড প্রোটেকশন, মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা
স্থান : ই-১১, বর্ধিত পল্লবী, মিরপুর-১১, ঢাকা
যোগাযোগ : ০১৭৩৩২১৯৯০১
ফি : ফ্রি সার্ভিস

সেন্টার ফর ট্রেনিং অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন অব ডেসটিটিউট ওমেন

সময় : রবি- বৃহস্পতি (সকাল ৯টা-দুপুর২টা)
সেবাগ্রহীতা : সুবিধাবঞ্চিত নারী
সেবার ধরন : মানসিক সাহায্য, ট্রেনিং পুর্নবাসন, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও আর্থিক সাহায্য
স্থান : মেইন রোড, প্লট -১৯, ব্লক-এ, সেকশন-১১, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
টেলিফোন : ৪০৩৪১১৯, ৮০৩৪২১৯, ৯০০১৭৩১, ৯০০৪৫৫৬
ইমেইল : heed@agni.com

নারী মৈত্রী

সময় : ৯.০০-৫.০০ (শুক্রবার বন্ধ)
সেবাগ্রহীতা : স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিশু, বাসায় কাজ করা শিশু
সেবার ধরন : শিক্ষা, শারীরিক ও মানসিক
স্থান : ৭০/৭ এর বি, মালিবাগ, চৌধুরীপাড়া
যোগাযোগ : narimaitree.cdw@gmail.com, www.narimaitree.com
ফি : ফ্রি সেবা

ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার

সম্পূর্ণ নারী পুলিশ দ্বারা পরিচালিত
২৪ ঘণ্টা সব ধরনের নারী ও শিশুদের সেবা প্রদান করে থাকে
চিকিৎসা সুবিধা (সোম ও মঙ্গলবার)
ফোন : ০১৭৪৫৭৭৪৪৮৭
ইমেইল : vscdmp@yahoo.com

Bangladesh Women's Health Coalition (BWHC)

সময় : ৯.০০-৪.০০, বৃহস্পতিবার : ৯.০০-২.০০
সেবাগ্রহীতা : শিশু-কিশোর, গর্ভবতী মহিলা
সেবার ধরন : শারীরিক ও মানসিক, প্রসব পরবর্তী সেবা, RT- যৌন অঙ্গের সাদা-স্রাব, MR
(খরচ- ৫০০-৭০০ টাকা), পরিবার পরিকল্পনার উপকরণ, যেমন : সুখি পিল, কনডম, প্রভেরা, প্যাথলজি সেবা
স্থান : নুরবাগ বাজার
যোগাযোগ : ০১৯১৫৬৫৭৭৩৬ (বেবি আপা), ০১৭৬০২৫২২৪১(বিডব্লিউএইচসি)
ফি- ডাক্তার ফি-১০০, দরিদ্রদের জন্য ছাড়

অপরাজেয় বাংলাদেশ

৩/২০ হুমায়ুন রোড, ঢাকা-১২০৭
নারী ও শিশুদের অধিকার, shelter নিয়ে কাজ করে। বর্তমানে Youth দের নিয়েও কাজ করছে
সময় : শনি-বৃহস্পতি (বৃহস্পতিবার ২টা পর্যন্ত)
দরিদ্রদের ফ্রি সেবা

Child Helpline: ১০৯৮

স্থান : ১৪/৩/A, স্বর্ণালি গার্ডেন, বাইশটেকি (BRTA মেইন গেট-এর বিপরীত পাশে), মিরপুর-১৩, ঢাকা-১২১৬
ফোন : ৯০২৯৫৫৬, ৯০২১২৬২, ৯০২১২৬৩

Genaration BreakThrogh

ফোন : ০৯৬১২৬০০৬০০

রিহ্যাবিলিটেশন/পুনর্বাসন কেন্দ্র

The society for Community-Health Rehabilitation Education and Awareness

সেবাগ্রহীতা : মাদকাসক্ত
সেবার ধরন : মাদকাশক্তি নিরাময়
স্থান : ১/১৪, ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
যোগাযোগ : +৮৮০-২-৮১১৫৮৮৭
ওয়েব : www.crea.rehab.com

সেন্টার ফর রিহ্যাবিলিটেশন অব দি প্যারালাইজড (CRP)

সময় : সপ্তাহে ৬ দিন
সেবাগ্রহীতা : শারীরিক, মানসিক সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি
সেবার ধরন : শারীরিক, মানসিক (কাউন্সেলিং), অর্থনৈতিক (অকুপেশনাল থেরাপি), পুনর্বাসন
স্থান : চাপাইন, সাভার (হেড অফিস), মিরপুর; গণকবাড়ি, মানিকগঞ্জ; মৌলভিবাজার, গোবিন্দগঞ্জ, সিলেট; এবং এ. কে খান ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম।
যোগাযোগ : +৮৮০-২-৭৭৪৫৪৬৪/৫
ইমেইল : contact@crp-bangladesh.org

আপন (আসক্তি পুনর্বাসন নিবাস)

সময় : ৯.০০-৫.০০
সেবাগ্রহীতা : শিশুবয়স্কদের জন্য
সেবার ধরন : মানসিক (কাউন্সেলিং)
স্থান : মানিকগঞ্জ (আবাসিক)
যোগাযোগ : ০১৭১১৪০০৫০০

ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ডি এম সি সি)

ব্র্যাক সেন্টার
৭৫ মহাখালী, ঢাকা-১২১২
যোগাযোগ : +৮৮০-২-৯৮৮১২৬৫

প্রশিক্ষণ সময়সূচি

সময়	১ম দিন	২য় দিন	৩য় দিন	৪র্থ দিন
১০.০০-১১.০০	- উদ্বোধন/স্বাগত বক্তব্য - জড়তা ভঙ্গ ও পরিচিতি - প্রশিক্ষণ-পূর্ব মূল্যায়ন - প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, প্রত্যাশা ও নীতিমালা - স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য - মনোসামাজিক সহায়তা	- পূর্বদিনের বিষয়বস্তুর পুনরালোচনা ও রিফ্লেকশন - মনোযোগী শ্রোতা	- পূর্বদিনের বিষয়বস্তুর পুনরালোচনা ও রিফ্লেকশন - মূল্যবোধ পরিচিতি	- পূর্বদিনের বিষয়বস্তুর পুনরালোচনা ও রিফ্লেকশন - SOLER - গোপনীয়তা ও নৈতিকতা
১১.০০-১১.৩০	চা-বিরতি			
১১.৩০-১.০০	- মনোসামাজিক শিক্ষা - মনোসামাজিক সহায়তাকারীর গুণাবলী - কৈশোরকালীন পরিবর্তন	- শিশু অধিকার - বুলিং ও সাইবার বুলিং - বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু	- নিরপেক্ষ মনোভাব	- আবেগ ব্যবস্থাপনা
১.০০-২.০০	মধ্যাহ্ন-ভোজনের বিরতি			
২.০০-৩.৩০	- সহমর্মীতা	- বাল্যবিবাহ - প্যারেন্টিং - প্রশংসা ও স্বীকৃতি (STROKE)	- জেন্ডার ও সেক্স - যৌন হয়রানি - কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া	- আত্মপরিচর্যা - রেফারেল - প্রশিক্ষণোত্তর মূল্যায়ন
৩-৩০-৪-০০	চা- বিরতি			
৪.০০-৪.৩০	- রিভিউ ও মুক্ত আলোচনা	- রিভিউ ও মুক্ত আলোচনা	- রিভিউ ও মুক্ত আলোচনা	- সমাপনী

মনোসামাজিক সহায়তা বিষয়ক সহায়িকা প্রণয়নে যারা অবদান রেখেছেন

নাম	পদবি
ডা. মো. শামসুল হক	লাইন ডিরেক্টর, এমএনসিঅ্যান্ডএএইচ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. মো. সবিজুর রহমান	প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এডোলসেন্ট অ্যান্ড স্কুল হেলথ প্রোগ্রাম
ডা. মো. আমানুল্লাহ	ডিপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার (এএইচ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. মো. জয়নাল হক	প্রোগ্রাম ম্যানেজার (এঅ্যান্ডআরএইচ), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
ডা. মনজুর হোসেন	অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, এমসিএইচ সার্ভিসেস, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
ডা. নাসরিন আক্তার	ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার (এমএনঅ্যান্ডই), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. আয়েশা আফরোজ চৌধুরী	ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জিএনপিএসইউ, এইচইইউ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রফেসর ডা. আফরোজা বেগম	প্রধান, এমসিএইচ বিভাগ, নিপসম
ডা. ফারিহা হাসিন	সহযোগী অধ্যাপক, ডিপিএইচআই, বিএসএমএমইউ
প্রফেসর সারিয়া তাসনিম	প্রফেসর, গাইনী ও অবস, ডিসিএমসি, ওজিএসবি
ডা. মো. মোখলেসুর রহমান	পিএম, এনএনএইচপি ও আএমসিআই, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. আবুল খায়ের মো. রফিকুল হায়দার	এডি-পিএসসি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. মো. জহুরুল ইসলাম	ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এনবিএইচ এনএনএইচপি ও আএমসিআই, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ইসমত জাহান	ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট ও প্রধান, এনটিসিসি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ডা. মো. মুনির হোসেন	প্রোগ্রাম অ্যানালিস্ট, ইউএনএফপিএ
শামীমা আক্তার চৌধুরী	প্রজেক্ট ম্যানেজার, বাপসা
ডা. শাহানা নাজনীন	কনসালট্যান্ট, কৈশোর স্বাস্থ্য, ইউনিসেফ
ডা. আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম	হেলথ স্পেশালিস্ট, ইউনিসেফ
ডা. ফারহানা শামছু সুমি	হেলথ অফিসার, ইউনিসেফ

দশ থেকে উনিশে আমরা তোমার পাশে

কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা

Kingdom of the Netherlands

brac ied

UNFPA

World Health Organization

unicef